

অভ্যুত্থান করে জনগণ

ফল ভোগ করে পুঁজিপতি, সাথী হয় সাম্রাজ্যবাদী মহাজন

আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের দুই বছর পার হলো। সংস্কার ও সংবিধান নিয়ে বড় বড় আলোচনা হচ্ছে, সংসদ গরম, সদস্যদের বাক্যবাণে। কিন্তু সেই আলোচনায় জনজীবনের সমস্যার কথা নেই। কারা প্রতারিত কিংবা পুরস্কৃত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তা নিয়ে চলছে সরকারি দল ও বিরোধী দলের পরস্পরের তর্ক-প্রতিযোগিতা। আশা, আশঙ্কা আর বিতর্কে দুই বছর কেটে গেল, কিন্তু জনজীবনের সংকট ও দুরবস্থা দুই দিনের জন্যও পিছু হটল না; বরং তা যেন নতুন করে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে।

এত আত্মত্যাগ ও এত বড় গণ অভ্যুত্থানের পর এত অল্প সময়ে তার পতনদশা তো স্বাভাবিক ছিল না। কেন এমন হলো? অভ্যুত্থানের আগে দেয়ালে শ্লোগান লেখা হয়েছিল— ‘শোন মহাজন! আমরা অনেকজন’। অনেকের অংশগ্রহণ, আহত হওয়া, জীবন দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, নতুন বন্দোবস্তের নামে নতুন মহাজনেরা কৃষ্ণগত করতে চাইছে সব সাফল্য। নতুন নতুন দখলবাজ নেমে পড়েছে মাঠঘাটে, বাজার, ব্যাংক ও বাণিজ্যে। ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি

করে মাজার ভাঙা আর প্রতিশোধের উন্মত্ত নেশায় সর্বত্র দখল চলছে বেপরোয়া গতিতে। উদ্দেশ্য তাদের একটাই—টাকা-সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া। ফলে নতুন রূপে অতীতের পুনরাবৃত্তি হতে দেখছে মানুষ। তাই তো অভ্যুত্থান করে সর্বজনীন জনগণ, আর অভ্যুত্থান-পরবর্তী সুবিধা লুটে নেয় পুঁজিবাদী স্বল্পজন।

বাজার সিডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে নামানো গেল না, ঋণখেলাপীদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হয়নি, পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনা গেল না। কিন্তু অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাল্টিমিলিয়নেয়ার; অর্থাৎ বহুকেটি টাকার মালিক হয়েছেন ৭ হাজার জন। আর গত তিন মাসে বেড়েছে ২ হাজার ২০৯ কোটিপতি। অভ্যুত্থান-পরবর্তী এক বছরে ২০২৫ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত বৃদ্ধি ছিল ৮৩৪.২ ফ্রাঁ, অর্থাৎ ১২ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা। কারা এরা? কীভাবে টাকা আয় করলো এবং জমা করলো সুইস ব্যাংকে? উত্তর কে দেবে?

সংসদ সদস্যদের সুবিধা কত, দায়িত্ব কী

আর তাদের জন্য বরাদ্দ কত? অতীতে সংসদ সদস্যদের বরাদ্দ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, বরাদ্দ ব্যবহারে দুর্নীতি জনগণ দেখেছে। তাই আলোচনা ছিল—আইনসভার সদস্যরা কেন প্রকল্প, রাস্তা আর নানা সহায়তার টাকা বিতরণ ও ব্যবহার করবেন। কিন্তু পরিবর্তন তো হলো না। বর্তমান ত্রয়োদশ সংসদের এমপিদের পত্নী উন্নয়ন বরাদ্দ আড়াই গুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা, যার পরিমাণ অষ্টম সংসদে ছিল ২ কোটি, দ্বাদশ সংসদে ২৫ কোটি। সংসদ অধিবেশন দুটো হয়েছে, সেখানেও বরাদ্দের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে।

অন্যদিকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক জনগণের কী দশা! তাদের জীবনে চলছে হাহাকার। মব তথা উশ্জ্বল গোষ্ঠীর সহিংসতা, একদিকে বেকারত্ব, অন্যদিকে বাড়ছে শ্রমিক ছাঁটাই। নানা অজুহাতে কারখানার পর কারখানা বন্ধ করা হচ্ছে। বিগত সরকারের বন্ধ করে দেওয়া ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল, ৬টি চিনিকলসহ বন্ধ কারখানা চালু করা তো দূরের কথা, এই সম্পদ ব্যক্তি মালিকদের কাছে হস্তান্তর প্রক্রিয়া চালু করা

হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদেরকে কুইক রেন্টাল কেন্দ্র স্থাপন করতে দিয়ে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুতের দফায় দফায় দাম বাড়িয়েছিল আওয়ামী লীগ। এখন বাকি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকেও বেসরকারি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গ্যাস-তেলের দাম বিশ্ব বাজারের অজুহাতে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় বৃদ্ধিও লাগামহীন।

একটা সমাজের নারীর অবস্থান দিয়ে সমাজ কতটা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি কতটা শক্তিশালী, তা বুঝতে পারা যায়। অভ্যুত্থানের পর অবস্থার উন্নতি হবে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু নারীরা যেন এখন নির্যাতনের সহজ টার্গেট। মৌলবাদী আক্রমণ ও অন্ত্রীল আচরণ—দুটোই ঘটছে নারীর ওপর ব্যাপকভাবে। নারী নির্যাতন ২০২৫ সালের জানুয়ারি-জুন ছিল ১ হাজার ৪২টি, আর ২০২৬-এর জানুয়ারি-জুন ৬ মাসে ১ হাজার ৬২১টি। শিশু নির্যাতন একই সময়ে ৬৭৩টি থেকে বেড়ে ১ হাজার ৭৭টি হয়েছে। এর বাইরেও যে কত এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দুই বছরের অভিজ্ঞতা : অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা বদল হয়নি

গণ অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে বাসদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

দুই বছর আগের ৫ আগস্টের কথা মনে হলে এখন যেন মানুষ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। চারদিকে এত মানুষ! কে আসেনি রাস্তায়? বয়সের বিবেচনায় শিশু থেকে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ছাত্র-শ্রমিক, সাধারণ মানুষ মিলে যেন সাগরের ঢেউ আর গর্জনের মতো জনতার ঢল নেমেছিল। আবেগ-উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা, লুটপাট, ভাঙচুর মিলে সে এক অন্যরকম বাংলাদেশ। একে দেখা হচ্ছিল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আর বিজয়ের উন্মাদনা হিসেবে। ভাঙচুর ও লুটপাট দেখে কিছুটা আতঙ্কিত হলেও জনগণ মনে করেছে—এ হচ্ছে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ক্ষোভ। বলা হয়েছে, সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেহেতু স্বপ্ন ছিল বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলে সবকিছু যুক্তির নিয়ন্ত্রণে আসবে।

দুই বছর পর সময় এসেছে বিবেচনা করার যে কতদূর আমরা এগোলাম। একথা তো ঠিক যে, বাংলাদেশ এক আন্দোলন আর অভ্যুত্থানের দেশ। এদেশের জনগণ কোনো অন্যায়, জবরদস্তি, দুঃশাসন মেনে নেয় না, কোনো স্বৈরাচারকেই ক্ষমতায় থাকতে দেয় না, বুকের রক্তে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, জীবন দিয়ে জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে—তা আবার প্রমাণ করেছিল ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে। দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরাচার ও স্বৈচ্ছাচারবিরোধী সংগ্রাম যেন



৫ আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তিতে মার্কিনের সাথে সম্পাদিত অসম বাণিজ্যচুক্তি বাতিল, বিদ্যুৎ-গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার, বন্দর ইজারা দেওয়ার পায়তারা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে বাসদের উদ্যোগে লাল পতাকা মিছিল প্রেসক্লাব-পল্টন মোড়-নুরহোসেন ফ্লোরার-গোলাপ শাহ মাজার সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও পরিচালনা করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ডা. মনীষা চক্রবর্তী ও খালেদুজ্জামান লিপন।

কেন্দ্রীভূত হয়েছিল জুলাই মাসে। কারফু দিয়ে, হেলিকপ্টার উড়িয়ে, পুলিশ, আর্মি, গোয়েন্দা সংস্থা আর দলীয় অস্ত্রধারীদের দিয়ে দমন করা যায়নি প্রতিবাদী ছাত্র-জনতাকে। পুলিশ বলেছে, ‘একটা গুলি করি, একটাই মরে, কিন্তু কেউ সরে না।’ এত অল্প সময়ে এত মৃত্যু স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশের মানুষ আর দেখেনি। জীবন দিয়েছে

অনেক মানুষ, যাদের মধ্যে ছিল ছাত্র, শ্রমিক, নারী, শিশু, পথচারী; আর আহত হয়েছে ২০ হাজারের বেশি। যাদের অনেকেই কোনোদিন চোখে দেখবেন না, নিজের পায়ে হাঁটবেন না, কারও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পেটের ভেতরের অংশ, স্বাভাবিকভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারবেন না অনেকেই। মৃতরা হারালো জীবন,

আর আহতদের হারিয়ে গেছে জীবনের ছন্দ।

বাংলাদেশ আন্দোলন আর অভ্যুত্থানের দেশ। রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতা থেকে নামানোর উদাহরণ বারবার সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের জনগণ। ১৯৬৯-এর অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছিল ৬১ জন, ১৯৯০ সালের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আভ্যুত্থান করে জনগণ, ফল ভোগ করে পুঁজিপতি, সাথী হয় সাম্রাজ্যবাদী মহাজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনা আছে, তা পত্রিকায় আসেনি।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র শিক্ষাব্যবস্থায়। একটা উদাহরণ থেকে সংকটের তীব্রতা বোঝা যাবে। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ৩৬ শতাংশ পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। নিবন্ধন করেও প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী ফর্ম পূরণ করেনি এবং পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এরা কোথায় হারিয়ে গেল? দারিদ্র্যের কষাঘাতে শিক্ষার আড়িনা থেকে ছিটকে পড়া এই শিশুদের ভবিষ্যৎ কী? এরা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে বেকারের মিছিলের সংখ্যা বাড়াবে শুধু।

মানুষ কী খাবে? খাদ্যে ভেজাল, শাকসবজিতে সীসা ও ক্যাডমিয়াম, কোথাও পানিতে মলজাত জীবাণু, শিশুখাদ্যে নিরাপদ সীমার চেয়ে অনেক বেশি টক্সিন, রান্নার তেলে অতিরিক্ত ট্রান্সফ্যাট, মুড়িতে ইউরিয়া, গুড়ে নিষিদ্ধ রাসায়নিক, বিস্কুট ও স্ট্রিটফুডে প্রিজারভেটিভ, টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিক। মাছ-মুরগি, ডিম-ফল—কোথায় বিসুদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তা? খাদ্য নিয়ে এত মুনাফাখোরি পৃথিবীর আর কোথাও কি আছে? মানুষ যেন দাম দিয়ে ভেজাল এবং বিষ কিনে খাচ্ছে। দেখার কে আছে?

সময়মত টিকা দিতে না পারা ও চিকিৎসা অব্যবস্থাপনায় হাম রোগে নয় শতাধিক শিশু মারা গেছে। এগিয়ে আসছে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার আতঙ্ক। ওষুধের দামের কোনও লাগাম নেই, মানের নিশ্চয়তা নেই। চিকিৎসা এখন রোগীর জন্য দুর্মূল্য এবং হাসপাতাল ব্যবসায়ীদের সহজে

মুনাফা অর্জনের অন্যতম উপায়। বর্তমানে বাজারে ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৪০০টি জেনেরিক ওষুধ আছে, তার মধ্যে সরকার মাত্র ১১৭টি ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি ওষুধের দাম কোম্পানিগুলো ইচ্ছামত বাড়ায়। দেশের চিকিৎসাব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ রোগীকেই বহন করতে হয়, ফলে ওষুধের দাম চিকিৎসাকে ব্যয়বহুল ও কঠিন করে তুলছে।

একদিকে আর্থিক সংকট, অন্যদিকে অপরাধপ্রবণতা—দুটোই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। অর্থনীতিতে লুণ্ঠন আর রাজনীতিতে দমন-পীড়ন একে অপরের পরিপূরক। গণতন্ত্রের চর্চা না থাকায় অসহিষ্ণুতা, রুচি ও মননের নিম্নগামিতা বেড়েই চলেছে। যুবসমাজের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদিতা, মাদকাসক্তি, ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচার—সবই চলছে লাগামহীন। তরুণ যুবকদের কারখানায় নিংড়ে নেওয়া, বেকার রেখে সম্ভা শ্রমিক বানানো আর লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করার সেই পুরোনো পুঁজিবাদী নীতিই অব্যাহত আছে। উগ্রতা ও নোংরামি বাড়ছে।

রাজনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা পালটে এখন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং তাদের সাথে জুলাই চেতনার নামে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর বিরোধ নতুন রূপ নিয়েছে। ক্ষমতা, পদ-পদবির মোহ, অর্থলিপ্সা জাগিয়ে যুবসমাজের চরিত্র নষ্টের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোনো নীতিবোধ, সমাজের

প্রতি দায়বোধ যেন গড়ে না ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে বামপন্থাকে হেয় করার পরিকল্পিত প্রচারণা চলছে।

বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ এককালে দেশাত্মবোধ, প্রগতিবাদী ধ্যান-জ্ঞান গড়ে তুলতে সাধনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের অনেককে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী হত্যা করেছে। তারপরও তাঁরা সমাজের প্রতি দায় পালন করেছেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এখন তাদের উত্তরাধিকার বহন না করে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ থেকে আত্মসুখ, বিভ ও খ্যাতির মোহে জাতিকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে নামকরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গবেষকদের ৩২৫টি গবেষণাপত্র চুরি ও অনিয়ম ধরা পড়ায় বৈশ্বিক জার্নাল প্রত্যাহার করেছে। একটা জাতির জন্য এ যে কত বড় লজ্জা!

মুসলমানি লেবাস দিতে গিয়ে সংস্কৃতিকে এমনিতেই সমাজবিমুখ করা হয়েছে। তারপরও প্রাতিষ্ঠানিক যতটুকু আয়োজন ছিল, তার ওপরও আক্রমণ আসছে, সংকোচন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তো বন্ধ হয়েছেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নৃত্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের ৭৫ শতাংশ

দুই বছরের অভিজ্ঞতা : অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা বদল হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামরিকশাসনবিরোধী অভ্যুত্থান সফল করতে জীবন দিয়েছিল ২৫০ জনের বেশি মানুষ, আর ২০২৪ সালে সরকারি হিসেবে জীবন দিয়েছেন ৮৪৪ জন—এবং এই সংখ্যা হাজারের বেশি বলে মনে করেন জনগণ। জীবন দেওয়ার তালিকায় ২৮৪ জন শ্রমিক, ২৬৯ জন ছাত্র, ১৩৬ জন কর্মচারী, ১৩৩ জন শিশু, ১২৫ জন ক্ষুদ্রপুঁজির ব্যবসায়ীর কথা বলা হয়ে থাকে। ফলে সমাজের সকল অংশের মানুষের জীবন দেওয়া প্রমাণ করে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ কেমন ছিল।

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, নির্যাতন-খুন, গুমের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন থামানো যায় না, দমন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। সমস্ত গণ আন্দোলনই জীবন ও রক্তের বিনিময়ে বিজয় অর্জন করে। ধারাবাহিক আন্দোলন কোনো কোনো মৃত্যুতে যেন দুর্বীর হয়ে ওঠে। যেমন, ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে আসাদ এবং মতিয়ুর শ্রেরণা ও সাহসের নাম। ’৯০-এর অভ্যুত্থানে নূর হোসেন, জিহাদ এবং ডা. মিলন স্বৈরাচারের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছে। গত ১৫ বছর আওয়ামী দৃষ্টশাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলনে অসংখ্য মানুষ জীবন দিয়েছে। কিন্তু ১৬ জুলাই আবু সাঈদের দুই হাত প্রসারিত করে স্বৈরাচারের বুলেট আলিঙ্গন করে জীবনদান অসংখ্য জীবনকে জাগিয়ে তুলেছিল, ভয়ের শাসনকে উচ্ছেদের শক্তি দিয়েছিল এবং শাসকদের মনেই ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে তুলেছিল।

মানুষের অধিকার ও মর্যাদার জন্য প্রতিটি লড়াই গৌরবের। এই গৌরব ধারণ করে পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে যায়। কিন্তু গৌরবের অপর পিঠেই থাকে ক্ষোভ। যে উদ্দেশ্যে লড়াই, তা যদি বিজয়ের পর বাস্তবায়িত না হয়, পুরোনো পথেই যদি দেশ চলে, তবে প্রশ্ন জাগে—এত রক্ত দিয়ে আমরা কী পেলাম? এই অপূর্ণতা যদি প্রতারণার পথে হাঁটে, তাহলে আবার ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে মানুষের মনে। আবার লড়াইয়ের শুরু

হয়। সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন এভাবেই

আবার গড়ে ওঠে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল স্বাধীনতার জন্য, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামাজিক সুবিচারের জন্য। কিন্তু ব্রিটিশ গেছে, স্বাধীনতা আসেনি; জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছে, ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, শিক্ষার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। বাইরের এই আক্রমণের অন্তরালে শক্তিশালী হয়েছে শোষণ। ফলে শোষণমুক্তি, অসাম্প্রদায়িকতার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তান ছিল ২২ পরিবারের শোষণ, সামরিক শাসন, ধর্মীয় নিপীড়ন আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রাষ্ট্র। এই প্রায় উপনিবেশিক শোষণের তীব্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছে বাংলার মানুষ। ফলে ৬ দফা এবং ১১ দফা জনগণের আন্দোলনের দাবিনামায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার অপূর্ণ স্বপ্ন আর শাসনক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের লুটপাট গণতন্ত্র, তথা জনগনের ক্ষমতায়নের বদলে সামরিক, বেসামরিক স্বৈরশাসন দেশের মানুষকে বারবার আন্দোলনের পথে টেনে আনে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ঘৃষ-দুর্নীতি, লুটপাট, টাকা পাচার তো ছিলই; আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে তা যেন সীমাহীন রূপ নিয়েছিল। বেকারত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিয়োগবাণিজ্য, পুলিশের গ্রেপ্তারবাণিজ্য, বিচারবহির্ভূত হত্যা-গুম-খুন মিলে দেশে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীনে একদলীয় নির্বাচন, ২০১৮ সালে রাতের ভোটের নির্বাচন, ২০২৪ সালে ‘আমি ডামির’ নির্বাচন—নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। নির্বাচনে পুলিশ, প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনকে ন্যাকারজনকভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন অপকৌশলের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করবে এবং ক্ষমতা ছাড়বে না। শুধু ক্ষমতা কুক্ষিগত করা আর বিরোধী মতের ওপর চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানোই নয়, দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া, বিদেশিদের সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করা আর নতজানু পররাষ্ট্রনীতি দেশের সম্পদ ও সম্মান দুটোই ধ্বংস করছিল। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের নামে লুটপাটনির্ভর রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা পছন্দের দলীয় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া, আদালতের স্মরণাপন্ন যাতে না হওয়া যায় তার জন্য দায়মুক্তি আইন করা, মেগা প্রকল্পের মেগা দুর্নীতির বোঝা জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া, ব্যাংকগুলোকে লুণ্ঠনের ক্ষেত্র বানানো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় আজ্ঞাবাহকদের নিয়োগ দিয়ে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভয়াবহ দুর্নীতি, পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসকে নিয়মিত বিষয়ে পরিণত করা, প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা, নদী, বন, পাহাড় দখলসহ নানা বিষয়ে মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে লাখ লাখ ছাত্র, শ্রমিক, নারীকে রাজপথে নামিয়ে এনেছিল। ছাত্র-শ্রমিক, জনতার এই অংশগ্রহণ ছিল অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি।

যে কোনো অভ্যুত্থানকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় আকস্মিক। কিন্তু যে কোনো বড় আন্দোলন অনেক আন্দোলনের যোগফল। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। স্বাধীনতার পর পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশ পরিচালনার কারণে মুক্তিযুদ্ধের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বারবার আন্দোলনের পথে নামিয়েছে। মানুষ পথে নামে, বিজয়ী হয়, কিন্তু দৃগুখজনক অভিজ্ঞতা হলো এই যে, জনগণ জীবন ও রক্তের বিনিময়ে স্বৈরাচারকে পরাজিত করে, আর পরবর্তীতে শাসকেরা তাদের পথই অনুসরণ

আসনই ফাঁকা। সঙ্গীত বিভাগে ২০২১-২২-এ ভর্তি ছিল ৪৭ জন, ২০২৫-২৬-এ সে সংখ্যা ১৬। নৃত্যকলা বিভাগে ছাত্র ৩০ থেকে ৭ জনে নেমেছে। এভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি-অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন-সাহিত্য, বিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় জাতির সর্বনাশেরই নিদর্শন দেয়।

তাহলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সকল ক্ষেত্রে ধস নামিয়ে উন্নয়নের কথা বললে মুষ্টিমেয় মানুষ তার সুফল পাবে আর দায় বহন করবে গোটা দেশের মানুষ। যে কারণে মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে ৩ হাজার ২০ ডলার—অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লাখ ৩৮ হাজার টাকা করা হয়েছে, জিডিপি হয়েছে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার, অথচ শ্রমিক পায় না ন্যায্য মজুরি, কৃষক পায় না ফসলের দাম। দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষের আয় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে কম। বাকি ৫ শতাংশ এমন বিপুল পরিমাণ আয় করে যে গড়ে জাতীয় আয় ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে বৈষম্য এখন আকাশচুম্বি।

বুর্জোয়া রাজনীতিতে এর হাত থেকে মুক্তি নেই। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে সমাজের ও রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রয়োজন, দরকার সমাজতন্ত্র-অভিমুখী লড়াই পরিচালনা করা। আর এটা প্রকৃত বামপন্থি—অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক বামপন্থি শক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। বাসদ সে সংগ্রামে সকল বাম-প্রগতিশীল শক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে

ফেনীতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের আগমনের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত (১৯২৬-২০২৬)

মানুষকে শোষণ ও বিভক্ত করার বিরুদ্ধে নজরুল-এর চেতনায় এগিয়ে আসতে হবে

কমরেড খালেকুজ্জামান

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ফেনীতে আগমনের শতবর্ষ (১৯২৬-২০২৬) উদ্‌যাপন উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ফেনী জেলা শাখার উদ্যোগে ‘শতবর্ষের আলোয়’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৫ জুলাই ফেনী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান। অনুষ্ঠানে তিনি মাসিক আনন্দ ভৈরবী প্রকাশনারও মোড়ক উন্মোচন করেন। চারণ ফেনী জেলার আহবায়ক অর্জুন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন লেখক ও সাংবাদিক ড. অখিল পোদ্দার, কবি ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব, বাসদ ফেনী জেলা শাখার আহবায়ক মালেক মনসুর, সমাজসেবক ও সংগঠক ইমন উল হক, কথাসাহিত্যিক শিহাব শহিদুল, লেখক ও ট্রাস্টি ফেনী ইউনিভার্সিটি ড. এ কে এম সাহিদ রেজা, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কালচারাল অফিসার সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও কবি আবু সাঈদ লিটন। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ফেনী জেলা শাখার সদস্যসচিব শামীম পাটোয়ারী।

কমরেড খালেকুজ্জামান আলোচকদের প্রতি সম্বাষণ জানিয়ে বলেন—

সাহিত্য সেবী ও অনুরাগী সভাপতি, আয়োজক ও আলোচকবৃন্দ, ফেনী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানপূর্বে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোর ও তাদের



অভিভাবকবৃন্দ এবং যারা যতভাবে এ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও শ্রম দিয়েছেন, তাদের সবাইকে বাসদ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১৯২৬ সালে ফেনী আগমনের শতবর্ষ পালন উপলক্ষে এমন একটা সময়ে আমরা মিলিত হয়েছি যখন বিশৃঙ্খলে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনোরকম রাখঢাক না রেখে একদম খোলামেলা চেহারা দিয়ে দস্যুতা, লুণ্ঠন-যুদ্ধ ও আধিপত্য বিস্তারের উন্মত্ততায় মেতে উঠেছে। ছুড়ে ফেলেছে তাদের এককালের বহুল উচ্চারিত মানবতা, সভ্যতার অঙ্গীকার। সাম্প্রদায়িকতাকে সুড়সুড়ি দেওয়া কিংবা সরাসরি হাতিয়ার করার কাজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদদ দিচ্ছে, মানুষকে বিভক্ত করার কাজে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগাচ্ছে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী এক সাম্রাজ্যবাদের কোল থেকে আরেক সাম্রাজ্যবাদের কোলে ঠাই নিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বকে অধিকতর বিপন্ন করে তুলছে। এদের কারণে ক্ষমতার হাতবদল, পালাবদল হলেও জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা, গোষ্ঠী সম্বাস, আর্থিক ব্যয়ভার ও কর্মহীনতার

সংকট চরমে উঠেছে। এরা জাতির অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিনাশের নতুন নতুন রাস্তা খুলেছে। তিন ধারায় খণ্ডিত শিক্ষাকে সর্বনিম্ন ধাপে নামিয়ে এনেছে। গরিব মানুষের স্বাস্থ্য চিকিৎসাসেবা পাওয়ার চেয়েও মৃত্যুকামনা বড় হয়ে উঠেছে। এসবের প্রতিকার তথা ‘৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও গণ অভ্যুত্থানের প্রকৃত গণ আকাজক্ষা বাস্তবায়নের উপযুক্ত শক্তি ও সংস্কৃতি গড়ে তুলে সঠিক পথের সন্ধান করাও যে এ ধরনের আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারই অংশ হিসেবে আজকের এই আয়োজন।

শুরুতেই বলে রাখি, আমাদের এই ভূখণ্ডে—বর্তমান বাংলাদেশে—নজরুল বহুবার এসেছেন এবং নির্বাক অবস্থায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে আনার পর শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে জন্মস্থানের সীমানা ডিঙিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হয়েছেন। ১৯৮৭ সালে আমাদের দলের পক্ষ থেকে নজরুলের ওপর আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নজরুল নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তা বর্ধিত কলেবরে

২০১৪ সালে নজরুল স্মরণে নামে মুদ্রিত হয়। সেখানে যথাসম্ভব আমরা নজরুলের জীবন ও সংগ্রামের বহুমুখী দিকের ওপর আলোকপাত করেছি। সময়ের বিবেচনায় আজ বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু বলে রাখছি যে, নজরুলের ওপর আলোচনার গুরুত্ব এবং প্রয়োজন তখন দেখা দিয়েছিল, কারণ সেই সময় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক একটি গোষ্ঠী নজরুলকে মুসলমানের কবি চিত্রিত করে আলোচনা-অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। তাই নজরুলের ওপর একটি সামগ্রিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ হাজির করা তখন জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে আমরা নজরুলকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ করার অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এখানে একটি কথা বলা দরকার—সেই বইটিতে নজরুলের বিভিন্ন উপলক্ষে ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ থাকলেও ১৯২৬ সালে তাঁর ফেনী আগমনের তথ্য জানা না থাকায় উল্লেখ করতে পারিনি। আরও কিছু স্থানের উল্লেখও বাদ থাকতে পারে। সেজন্য বিশেষভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, কৃষিনির্ভর অর্থনীতিরকালে ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বঙ্গদেশ কৃষি, কৃষ্টি, পরিবেশ-প্রকৃতি, আবহাওয়া-জলবায়ু, ঋতুবৈচিত্র্য, পানি-পলি ইত্যাদি মিলে অভাবনীয় প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছিল। তার আলোকেই বহুদূরগামী ছিল বিধায় ভারতবর্ষে পর্তুগিজ-ওলন্দাজ, শক-ছুন, তাতার-আফগান, পাঠান-মোগল, ব্রিটিশদের বণিকী লুণ্ঠনের কাহিনিতে ভরপুর। মোগলরাই শুধু স্থায়ী হয়ে শাসককূলে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রায় দুশো বছরের শাসন কায়মে শেষে বিদায় এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মালিকানা নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে ইআইএস চালু কর ৥ পে-স্কেল হলো, এবার শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ কবে হবে?

পে-স্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে

অলিম্পিক সিমেন্টসহ বন্ধ কারখানা চালু কর; শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করো

পে-স্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ও সেক্টরভিত্তিক মজুরি নির্ধারণ, শ্রম আইনের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ বাতিল, গণতান্ত্রিক বিধিমালা প্রণয়ন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) চালু এবং বরিশালের অলিম্পিক সিমেন্টসহ বন্ধ কারখানাসমূহের শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনা অবিলম্বে পরিশোধের দাবিতে ২৪ জুলাই ‘২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুলের সম্বলনায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সহসাধারণ সম্পাদক নবকুমার কর্মকার, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, অর্থবিষয়ক সম্পাদক আবু নাজিম খান বিপ্লব, কৃষি শ্রমিকবিষয়ক সম্পাদক



সাইফুজ্জামান টুটুল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কোহিনুর আক্তার কণা ও কিবরিয়া হোসেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের মূল শ্লোগান ছিল বৈষম্যের বিলুপ্তি। সেই অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে যারাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন তারা সেই চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। সরকার ইতিমধ্যে পে-স্কেল ঘোষণা করেছে। সেই পে-স্কেলের নিম্নতম স্তরে কর্মরত

একজন কর্মীর মূল মজুরি ২০ হাজার টাকা হিসেবে মোট মজুরি পাবেন প্রায় ৩৫ হাজার টাকা, যা শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘদিনের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণার দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তাছাড়া শ্রম আইন সংশোধন হয়ে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় ৫ বছরের স্থলে ৩ বছর নির্ধারণ হওয়ায় অনেক শ্রমখাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময় হয়ে গেছে বা পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে সময় হবে;

সেক্ষেত্রে এখনই মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের সময় শ্রমিকের অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে প্রিভিডেন্ট ফান্ড গঠনের আবেদন প্রক্রিয়া, যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির ক্ষমতা হ্রাস করা এবং শ্রমিককে বঞ্চিত করার ধারাসমূহ বাতিল না হওয়ায় শ্রম আইন গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করেনি। শ্রম আইনে শ্রমিকের যেসকল অর্জিত অধিকার সংকুচিত হয়েছে, তা কিছু পরিমাণে পূরণ করতে বিধিমালায় শ্রমিকপক্ষের উত্থাপিত প্রস্তাব যথাযথভাবে যুক্ত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার যে প্রতিশ্রুতি, তা বাস্তবায়ন করতেও সর্বক্ষেত্রে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ইআইএস চালু করতে হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বরিশালের অলিম্পিক সিমেন্ট কারখানাসহ যে সকল কারখানার মালিক শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার বেতন ও পাওনা টাকা পরিশোধ না করে নিজ স্বার্থ বিবেচনায় কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং শ্রমিকদের পাওনা আইননির্ধারিত সময়ে ও পরিশোধ না করে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন, সেই মালিকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে নগরীতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ফেনীতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের আগমনের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

নিয়েছে। আজকের বাংলাদেশের ভূমিজুড়ে কৃষি, কৃষ্টি বা বাণিজ্যের বিকাশ বিদেশি শাসন-শোষণে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার অনন্যতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট ছিল না। ফেনী যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা ফেনীর অন্যতম কৃতী সন্তান নাট্য আন্দোলনের ব্যতিক্রমধারার স্রষ্টা সেলিম আলদীন ২০০৭ সালের ২৩ জুন ফেনীতেই এক আলোচনা সভায় বলেছিলেন—

‘...একসময় ফেনী ছিল বাংলাদেশের অন্যতম অসাম্প্রদায়িক লীলাভূমি। আমার মনে আছে, তখন ডাক্তারপাড়া, ফেনী কলেজ, মাস্টারপাড়া সংগীত ও নাট্য চর্চায় মুখরিত। ফেনী কলেজের রেওয়াজ ছিল বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের। ১৯৬৬ সালে আমি কলেজের সেই বার্ষিক নাটকে দুই দিনব্যাপী অভিনয়ে অংশগ্রহণও করেছি। তখন ফেনী শহর ছিল ছোট, কিন্তু অন্তর ছিল অনেক বড়।’ ‘ফেনী সমগ্র বাংলাদেশের একটি দৃষ্টান্তস্থল হয়ে উঠবার চেষ্টা করবে। কারণ আমাদের পূর্বজনের মধ্যে রয়েছেন কালজয়ী মানুষেরা। তাদের কেউবা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, কেউবা জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার।’

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছিলেন উপন্যাস লালসালু, জহির রায়হানের সাহিত্যকর্মের বাইরে তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্র, শহীদুল্লাহ কায়সারের বিপ্লবী ভূমিকা ও সাহিত্যরচনা মানুষকে যুক্তিবাদী ও মানবিক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। সেলিম আলদীন তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলেন, ‘যে জাতি একদিন মসলিন বুনে ইউরোপে রূপকথার দেশে পরিণত হয়েছিল, সে জাতি এখন সেলাই মেশিনের দ্রুততম চলমানতার ওপর চোখ রাখে। ও না হলে টাকা মিলবে না। ...’ কারণ ‘পণ্য সভ্যতার এক হীন ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে মানুষ। ...’

নজরুলের সাহিত্যকর্মের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে—ফেনী পরশুরামের কৃতী সন্তান হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও তার বোন শামসুন্নাহার মাহমুদকে নিয়ে কবি নজরুল কবিতা লিখেছেন।

সবকিছু বিবেচনায় এ অনুষ্ঠানের এবং এ ধরনের নানা উদ্যোগের পেছনে আয়োজকদের এ চিন্তাও কাজ করে থাকতে পারে যে, ফেনীর হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আবারও সমৃদ্ধ করে তাকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজের জন্য ইতিমধ্যে শতাধিক সাহিত্য-নানামুখী কর্মকাণ্ডে সাক্ষর রাখা ব্যক্তিত্বের সন্ধান আমরা পাই। তাদের অনেকের নাম করা যায় এবং কেউ কেউ উপস্থিতও আছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কিছু প্রকাশনা—যেমন সম্পাদক শাবিহ মাহমুদ, নির্বাহী সম্পাদক শামীম পাটোয়ারী, প্রকাশক রাবেয়া সুলতানা ও সম্পাদকমণ্ডলীর ৬ সদস্য মিলে *ফেনী সাহিত্য সভা ২০২৫* স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—তা কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও প্রশংসার দাবি রাখে।

আজকের এই সভায় নজরুল সম্পর্কে দু-চার কথা বলার আগে এটা স্বীকার করতে হবে যে, বহুবিচিত্র ধারায় বিকশিত ও প্রসারিত নজরুলকে এখনও আমরা সামগ্রিক পূর্ণতায় ধারণ করে উঠতে পারিনি। এর জন্য অনেক সাধনা ও সময়ের প্রয়োজন। তারপরও যতটুকু তাকে আমরা জানতে পাই—তিনি একাধারে কবি, গল্পকার-উপন্যাসিক, নাট্যকার-অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার-গীত্যালেখ্য ও গীতিনাট্য রচয়িতা, সুরকার-গায়ক, বাদক, সাংবাদিক-সম্পাদক, পত্রিকা পরিচালক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র কাহিনিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সৈনিক।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ধারেকাছেও এত গুণের সমাহারের তুলনা চলে



না।

নজরুলের উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে আসে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার রাজ্যশাসলিন্সা ও ধ্বংসাতণ্ডব; ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের নতুন সভ্যতার উন্মেষ; কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে নব্য তুরস্কের জাগরণ, ভারতে ইংরেজদের বর্বর নিপীড়ন-হত্যায়জ্ঞ এবং ভারতীয় নবজাগরণের সম্ভাবনা, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ফণা—সবকিছু মিলে নজরুলের ভাবমনে এক দৃঃখবেদনা ও মহোদ্বীপনার দ্যোতনা তৈরি করেছিল, যার ভেতর দিয়ে নজরুল বিদ্রোহী কবি নজরুল হয়ে উঠেছিলেন।

সেজন্য তিনি বলেছিলেন, ‘বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তুর্যবাদকের একজন আমি, ...আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাক্যে বাক্যে কুটিলফণা ভূজঙ্গ প্রখর দর্শন, শাদুল পশুরাজের ক্রকৃতি! এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবুও ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।’ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন শুরু থেকে ব্রিটিশের বিদায় পর্যন্ত ৪টি ধাপের সময়কাল এভাবে বিভক্ত করা যায়—

১৭৫৭-১৮৫৭ : বিদ্রোহ শুরু এবং মহাবিদ্রোহ
১৮৫৭-১৮৮৫ : মহাবিদ্রোহ থেকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫-১৯০৫/৬ : বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬-১৯৪৭ : ব্রিটিশ শাসনমুক্ত
কাজী নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এবং ১৯৪২ সালে বাকশক্তি রহিত হয়ে অসুস্থবোধ ও ক্রমাগত তার অবনতি হতে থাকে। ২৪ বছর নির্বাক হয়ে জীবিত থেকে ১৯৭৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাকে ১৯৭২ সালে জাতীয় কবি রূপে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং এখানেই তিনি ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে ১৯৪২ পর্যন্ত ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনা ও সংগ্রামেরকাল।

নজরুল কীভাবে স্বাধীনতাকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তা কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তব্য থেকেই ধারণা করা যায়। ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুল সম্বর্ধনায় সভাপতি বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন, ‘আমরা আগামী সংগ্রামকে কবি নজরুলের সঙ্গীতকণ্ঠে ধারণ করে শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করব। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার কথা একখানা বইতে সেদিন পড়তে ছিলাম। তাতে লেখা দেখলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটি অতি-মানুষে পরিণত হবে।’

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেন, ‘আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব, তখন সেখানে নজরুলের

গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।’

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৮৪-১৯৭০) ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ প্রবন্ধে লেখেন, ‘স্বদেশী আন্দোলনের সমস্ত বীর্য নিয়ে তিনি (নজরুল) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন। তাঁর অপূর্ব তারুণ্য আর অপূর্ব স্বাধীনতাপ্রীতি দেখতে দেখতে তাঁকে প্রিয় করে তুললো বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে। নজরুল ইসলাম একালের বাঙালি, যিনি বাংলার মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের চিত্ত আন্দোলিত করতে সক্ষম হলেন।’

১৯২৬ সালে তিনি ফেনীতে আসেন। সে সময়ে তাঁর ফেনীতে আগমনসহ কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন তিনি সে সময় কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ঢাকা বিভাগ থেকে। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে সমগ্র ঢাকা বিভাগ ছিল (ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে)। মোট প্রার্থী ছিল ৫ জন—১. মুহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী (বরিশালের জমিদার), ২. আবদুল হালিম গজনবী (তখনও নাইট হননি), ৩. আবদুল করিম (ঢাকার নবাববাড়ির লোক), ৪. কাজী নজরুল ইসলাম, ৫. মফিজউদ্দিন আহমদ। জিতেছিলেন ইসমাইল চৌধুরী ও আবদুল হালিম গজনবী। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটার ছিল ১৮,১১৬ জন।

তিনি ১৯২৫ সালে শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির মুখপত্র *লাঙল পত্রিকা* শ্রমিকদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেছিল যা আজও প্রাসঙ্গিক। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, সপ্তাহে সাড়ে ৫ দিন কর্মদিন করা, নারী ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ শর্ত, শ্রমিকের আবাসন ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত আইন দ্বারা বাধ্য করা, অসুখ-বিসুখ-দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা ও বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিক রক্ষা আইন, মালিকদের খরচায় শ্রমজীবীদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, লাভের ভাগে শ্রমিকদের অধিকারী করা, কলকারখানার নিকট থেকে বেশ্যালয় ও নেশার দোকান উঠিয়ে দেওয়া, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান করা, শ্রমিক সংগগুলিকে আইনত মানিয়া নেওয়া, আর কৃষকদের জন্য কো-অপারেটিভ কৃষি ব্যাংক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজনি ও লোভী ব্যবসাদারদের হাত থেকে কৃষককে উদ্ধার করার দাবি উল্লেখিত হয়েছিল।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের পাশাপাশি দেশীয় শোষকদের তৎপরতাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাই তাঁর আহ্বান ছিল—

‘বল! কারও অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।

কাগুরী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর/ বাঙালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর/ ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর/ উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।’

তিনি ১৯২৫ সালে *লাঙল পত্রিকা* প্রকাশ করেন। *লাঙল পত্রিকা*য় কী কী থাকবে তা তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছিলেন—১. কবিতা, ২.

গোর্কির মা-এর ধারাবাহিক অনুবাদ, ৩. মার্কসের জীবনী, ৪. প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা, ৫. গণআন্দোলন-সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা, ৬. ১টি করে ছবি। এই তালিকা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাম্যবাদী চিন্তা তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এরপর ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট থেকে *লাঙল গণবাণী* নামে প্রকাশিত হতে থাকে। তার পর *যুগবাণী* প্রকাশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই তা বাজেয়াপ্ত হয়।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা নজরুলকে শুধু ব্যথিতই করেনি, দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধও করেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ এবং ভগ্নামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনন গড়ে তুলতে তাঁর লেখা আজও প্রাসঙ্গিক। ১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল রাজরাজেশ্বরী পূজা উপলক্ষে মসজিদের পাশে গান-বাজনাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ এক দাঙ্গার সূচনা হয়। ৩, ৪ ও ৫ এপ্রিল দাঙ্গায় ৪৪ জন নিহত, ৫৮৪ জন আহত হয়। ২২ এপ্রিল দাঙ্গায় ৬৬ জন নিহত, ৩৯১ জন আহত হয়। এর জবাবে ‘কাগুরী হুশিয়ার!’, ‘মন্দির-মসজিদ’, ‘হিন্দু-মুসলমান’, ‘যুদ্ধ’ ইত্যাদি কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৬ সালের ২ এপ্রিলের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ‘মন্দির ও মসজিদ’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

‘আবার হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড বেধে গেছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হয়ে গেল। আল্লার এবং মা কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যারা এতক্ষণ মাতাল হয়ে চিংকার করছিল, তারাই যখন মার খেয়ে পড়ে যেতে লাগল—দেখলাম, তখন আর তারা আল্লামিয়া বা কালীঠাকুরানির নাম নিচ্ছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়ে থেকে এক ভাষায় আত্নাদ করছে—‘বাবা গো, মা গো।’ মাতৃ পরিত্যক্ত দুইটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করে এক স্বরে কেঁদে তাদের মাকে ডাকে। দেখলাম, আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলল না, মন্দিরের পাষণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হয়ে রইল।’

তিনি লেখেন, ‘মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ।’ ‘হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাগুরী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র।’

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১৯১৭ সালে সংঘটিত হলে তা নজরুলকেও প্রভাবিত করে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনায় ‘ফরিয়াদ’-এ লেখেন—

‘এই ধরনীর যাহা সম্বল/ বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল/ সুস্পষ্ট মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান/ সকলের এতে স

ম অধিকার এই তার ফরমান।’
‘বিংশ শতাব্দীতে’ লেখেন—‘পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে/ ইউরোপ, রাশিয়া, আরব মিশর চীন/ আমরা আজিকে একপ্রাণ একদেহ/ এক বাণী—কারো অধীনে রবে না কেউ।’

‘অগ্রপথিক’-এ লেখেন—‘আয়ারল্যান্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া, চীন/ নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া সবার ধরি গো ঋণ/ সবার রক্তে মোদের লোহর আভাস পাই/ এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই।’

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতা তুলে ধরে তিনি যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন, শোষককে চিনতে যেন ভুল না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি, আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। ...আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভেতর দিয়ে চলতে হবে। ...ওরে পতিত, ওরে চিরলাঞ্ছিত, তুই দেখ এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের কথা : ভিল্‌হেল্ম লিবনেখট



[ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস : জন্ম ২৮ নভেম্বর, ১৮২০; মৃত্যু : ৫ আগস্ট ১৮৯৫। ৫ আগস্ট মার্কসবাদের অন্যতম রূপকার ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ জার্মানির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, মার্কস-এঙ্গেলস-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভিল্‌হেল্ম লিবনেখট-এর লেখা **ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কথা** নামক সংক্ষিপ্ত জীবনীটি প্রকাশ করছি শ্রদ্ধার্থ্য হিসাবে। সম্পাদক]

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের মস্তিষ্কটি ছিল স্বচ্ছ ও সু-আলোকিত, সব রকম রোমান্টিক বা ভাবপ্রবণ কুহেলিকা থেকে মুক্ত। মানুষকেও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি রঙিন চশমা অথবা স্বপ্নবাস্পের আন্তরণের মধ্যে দিয়ে দেখতেন না তিনি, দেখতেন নির্মল প্রোজ্জ্বল চোখ মেলে, সর্বদাই স্বচ্ছ উজ্জ্বল বায়ুস্তর ভেদ করে, স্পষ্ট করে, স্বচ্ছভাবে। তাঁর দৃষ্টি বস্তুবিশ্বের উপরিতলে মাত্র সীমাবদ্ধ থাকত না, প্রতিটি বস্তুর মর্মে পুরোপুরি প্রবেশ করে একেবারে তার শেষ দেখে ছাড়ত। ওই স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কথ াটির সত্যিকার ও স্বাভাবিক মানবিক অর্থে ওই ‘অলোকদৃষ্টি’, জননী প্রকৃতি খুব অল্প লোককেই জন্মসূত্রে যা দান করে থাকেন সেই মুক্ত দৃষ্টি ছিল এঙ্গেলসের চরিত্রের একটি মৌল লক্ষণ। প্রথমবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই তাঁর এই বিশেষ চারিত্র্যলক্ষণটি আমার কাছে ধরা পড়ে।

নীল জেনেভা হ্রদের তীরে ১৮৪৯ সালে গ্রীষ্মের শেষাংশে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। রাইখ সংবিধানের সপক্ষে আন্দোলনের ব্যর্থতার পর জেনেভায় আমরা কয়েকটি শরণার্থী কলোনি বসিয়েছিলাম।

এর আগে নানা ধরনের কয়েকজন ‘মহৎ ব্যক্তি’র সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেছিল আমার। এঁরা হলেন রুগে, হাইসেন, ইউলিউস ফ্রোবেল দ্রুভে এবং বাডেন ও স্যাক্সনি ‘বিপ্লব’-এর অন্য বহুবিধ ‘জননেতা’। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল ততই এঁদের গরিমা ম্লান হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে, ক্ষুদ্রতর ঠেকেছিল লোকগুলিকে।

আবহাওয়া যত ধোঁয়াশাচ্ছন্ন থাকে, মানুষ ও বস্তুকে ততই বড়ো দেখায়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সেই বিশেষ গুণটি ছিল যার বলে তাঁর স্বচ্ছ সুচোখের সামনে থেকে সকল ধোঁয়াশা লুপ্ত হয়ে যেত, মানুষ আর বস্তুকে হুবহু মানুষ আর বস্তুর মতোই দেখাত। এই গুণজাত তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে এবং তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্যোতক সেই প্রখর বিচারক্ষমতায় প্রথম-প্রথম আমার অস্থি জাগত, এমনকি মাঝে-মাঝে আহতও বোধ করতাম। এটা ঠিক যে রাইখ সংবিধানের সপক্ষে আন্দোলনের ‘বীরবৃন্দ’ যে

এঙ্গেলসের চেয়ে আমাকে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তা নয়, তবু আমার মনে হয়েছিল ওই আন্দোলনে বহু মূল্যবান শক্তির উপাদান এবং প্রচুর সোৎসাহ আত্মত্যাগ নিহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি যেন গোটা আন্দোলনকেই খাটো করে দেখছেন।

আবার ওই একই সঙ্গে, দক্ষিণ জার্মানির লোক না হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণদেশীয় জার্মানের শান্তসহিষ্ণু ভাব-এর যে-অবশেষ তখনও পর্যন্ত আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল (যা পরে ইংল্যান্ডে থাকার সময় আমার মধ্যে থেকে ঝেড়েপুঁছে সম্পূর্ণ সাফ হয়ে যায়) তা-ও ব্যক্তি ও বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অবশ্য সব সময়েই যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা একমত হতাম তা নয়। ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা বিষয়ে এঙ্গেলসের বইখানি আমি এর অনেক আগেই পড়েছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে তাঁর জ্ঞানের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যের ব্যাপারে সম্যক উপলব্ধি অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলাম। ফলে এ-ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে আমার বেশি দেরি হয়নি যে এঙ্গেলসের প্রতিটি মতামতের পিছনে দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট যুক্তি থাকত।

নিচে থেকে উঁচুতে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মনে হতো, বহু অসাধ্যসাধনের নায়ক এই ব্যক্তিটি আমার চেয়ে মাত্র বছর পাঁচেকের বড়ো। বস্তুত পাঁচটা বছর ছিল এক্ষেত্রে গোটা একটা শতকের সমান।

শিগগিরই এটাও আমার নজরে পড়ল যে সামরিক ব্যাপারে তিনি রীতিমতো পারদর্শী। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি জানতে পারলাম যে ইতিপূর্বে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় হাঙ্গেরির বৈপ্লবিক যুদ্ধ সম্পর্কে যে-প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যে-সব প্রবন্ধের বিশ্লেষণ ইত্যাদি সর্বদা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় সেগুলি হাঙ্গেরির সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের রচনা বলে একটা ধারণা চালু হয়ে গিয়েছিল, তা আসলে ছিল এঙ্গেলসেরই লেখা। অথচ তিনি নিজেই একদিন হাসতে হাসতে আমায় বলেছিলেন যে প্রবন্ধগুলি লেখার সময় অন্য খবরের কাগজের কাছে তথ্যের যে-মালমশলা ছিল তাঁর হাতে তার বেশি আর কিছুই ছিল না। আর ওই মালমশলা প্রায় সম্পূর্ণতই পাওয়া গিয়েছিল একমাত্র অস্ট্রিয়ান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, যে-গভর্নমেন্ট একেবারে জলজ্যান্ত মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করছিল। বর্তমান স্প্যানিশ গভর্নমেন্ট কিউবার ব্যাপারে যা বলছে হাঙ্গেরির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ান গভর্নমেন্টও ঠিক সেই কথাই বলে চলেছিল তখন-অর্থাৎ কিনা, তারাই হরদম একতরফা জিতে চলেছে। কিন্তু এঙ্গেলস এক্ষেত্রে তাঁর সেই অলোকদৃষ্টিটি কাজে লাগালেন, লম্বাচওড়া বাতচিহ্নের দিকে দৃকপাতমাত্র করলেন না। তাঁর মস্তিষ্ক থেকে তখনই রঞ্জনরশ্মি বিকিরিত হতে শুরু করেছে; আর আমরা জানি, ওই রশ্মিগুলি প্রতिसরণের তির্যকীকরণের অধীন নয়, ‘ক’ অক্ষরকে তারা ‘গ’ করে দেখায় না। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কোন-কোন বস্তু অপ্রয়োজনীয় মস্তিষ্কের রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে এঙ্গেলস তা বুঝে ফেললেন এবং কোনো ধোঁয়াশা বা মরীচিকাকে তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে দিলেন না, তিনি সঁটে রইলেন যা প্রকৃত যা বাস্তব তার সঙ্গে—অর্থাৎ তথ্যের সঙ্গে। মৃত্যুর মুখে যতই তুড়ি বাজিয়ে মস্ত বীরপনা ফলিয়ে অস্ট্রিয়ান গভর্নমেন্ট তার ‘ঘনাদা’ সুলভ ঘোষণাপত্রগুলি প্রচার করুক না কেন, কিছু কিছু তথ্যের উল্লেখ না করে তাদের উপায় ছিল না। যেমন তাদের উল্লেখ করতে হতো যে-সব জায়গায় সংঘর্ষগুলো ঘটছে সে-সব জায়গার নাম, যুদ্ধের সূচনায় ও

শেষে সৈন্যরা কোথায় ছিল ও কোথায় আছে তার খবর, সংঘর্ষের সময়নির্ঘণ্ট, সৈন্যচলাচলের খবর, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর খবরের এইসব টুকরোটাকরা আর খণ্ড ভগ্নাংশগুলো দিয়ে, এগুলোকেই জুড়ে জুড়ে স্বচ্ছ ও প্রোজ্জ্বল-দৃষ্টি চক্ষুস্থান আমাদের ফ্রেডরিখ শিল্পী ক্যুভিয়ের মতো রণক্ষেত্রের ঘটনাবলির সত্যিকার চিত্রটি তুলে ধরতেন। রণক্ষেত্রের ভালো একটি মানচিত্রের সাহায্যে ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তারিখ ও জায়গার নাম থেকে একেবারে গাণিতিক নির্ভুলতায় এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছিল যে ‘বিজয়ী’ অস্ট্রিয়ানরা ক্রমাগত পিছনে ‘এগিয়ে যাচ্ছে’ আর ‘পর্যুদস্ত’ হাঙ্গেরিয়ানরা ক্রমশ সামনে ‘হটে যাচ্ছে’! ওই আঙ্গিক হিসেব এতই সঠিক ছিল যে কাগজপত্রে যেদিন প্রকাশিত হলো অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী হাঙ্গেরিয়ানদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেছে তার পরদিনই অস্ট্রিয়ান বাহিনীকে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় হাঙ্গেরি ছেড়ে পালাতে দেখা গেল।...

প্রসঙ্গত বলি, মনে হয় এঙ্গেলস যেন সৈনিক হবার জন্যে জন্মেছিলেন। তাঁর ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি, দ্রুত উপলব্ধির ক্ষমতা এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার মূল্য যাচাইয়ের শক্তি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য এবং অবিচল ধীরস্থির ভাব। পরবর্তীকালে সামরিক সমস্যাদি নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং ছদ্মনামে লিখলেও তার জন্যে প্রথম শ্রেণির সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ওই বিশেষজ্ঞদের অবশ্য কোনোই ধারণা ছিল না যে আলোচ্য পুস্তিকাগুলির অজ্ঞাতপরিচয় লেখক-ব্যক্তিটি ছিলেন তখনকার দিনের সবচেয়ে ‘কুখ্যাত’ বিদ্রোহীদের একজন।...

লন্ডনে থাকতে আমরা ঠাট্টা করে এঙ্গেলসকে ডাকতাম ‘জেনারেল’ বলে। তাঁর জীবদ্দশায় যদি আর একটা বিপ্লব ঘটত তাহলে এঙ্গেলসের মধ্যে আমরা পেতাম সেনাবাহিনীর ও সামরিক বিজয়ের সংগঠক, সমরবিদ্যায় ধীমান কার্নোকে।

সুইজারল্যান্ডে সেবার অল্প কিছুকাল এঙ্গেলসের সঙ্গে কাটানোর পর পরের বছর লন্ডনে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। প্রথমে তিনি লন্ডনে চলে এসেছিলেন। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ সর্বদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

বস্তুত, এঙ্গেলস লন্ডন ছেড়ে ১৮৫০ সালে ম্যানচেস্টারে চলে যান (আমি তখন বাস করছিলাম লন্ডনে) তাঁর বাবার ব্যবসায় যোগ দিতে। রাইনের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো এঙ্গেলসের বাবারও ইংল্যান্ডে একটি ব্রাঞ্চ অফিস ছিল। এঙ্গেলস কিন্তু প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন লন্ডনে, কখনও কখনও কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্যেও। মার্কসকে তিনি চিঠি লিখতেন প্রায় প্রতিদিন, আর ওই সব চিঠির যতখানি অংশ নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকত না ততখানি মার্কস নিয়মিতভাবে আমাদের পড়ে শোনাতেন—আমাদের মানে, প্রায়ই পরিবর্তনশীল মার্কস গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য সদস্যদের।

এটা অবশ্য সত্যি যে মার্কসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল এঙ্গেলসের সঙ্গে কখনোই তা ছিল না। বারো বছর মার্কসের বাড়িতে আমি ছিলাম প্রায় প্রাত্যহিক অতিথি, পরিবারেরই প্রায় একজন সদস্য। তবে মার্কসের মৃত্যু আমাকে এঙ্গেলসের আরও নিকটবর্তী করে তুলেছিল।

এঙ্গেলসকে তখন মার্কসের স্থানাস্থিকারী হওয়া ও তাঁর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও আরন্ধ কর্ম পূরণের দ্বৈত কর্তব্য পালন করতে হচ্ছিল।

আর একমাত্র তখনই তিনি, যিনি তার আগে পর্যন্ত (তাঁর নিজের ভাষায়) ‘দোহার’ মাত্র ছিলেন, দেখিয়ে দিলেন তিনি কতদূর কী করতে পারেন। দেখিয়ে দিলেন, তিনি ‘মূল গায়ন’ও

হতে সমর্থ।

তার আগে বছর বিশেক সময় ধরে যে-কর্মশক্তিকে তিনি প্রধানত ব্যবসার কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা এখন পুরোপুরি পূর্বোক্ত দ্বৈত কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োগ করলেন। পুঁজি বইটি যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করলেন তিনি, তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক রচনার কাজে আশ্চর্য কর্মশক্তির উদ্বোধন ঘটালেন এবং কাজ করার অসামান্য ক্ষমতার দরুণ এরই ফাঁকে-ফাঁকে তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র লেখালেখিরও উপযোগী সময় করে নিতে সক্ষম হলেন। আর, বলা বাহুল্য, এঙ্গেলসের সে-সব চিঠি সাধারণ চিঠি ছিল না, প্রায়ই সেগুলি হয়ে দাঁড়াত রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পথনির্দেশ ও পরামর্শদানের নামান্তর।

যেখানেই তাঁকে দরকার পড়ত সেখানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তিনি; চারপাশের সবাইকেই তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। উপদেশ দিয়ে, উপরোধ-অনুরোধ করে, সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মৃত্যুর অল্প আগে পর্যন্তও সক্রিয় সৈনিক হিসেবে এঙ্গেলস অংশগ্রহণ করে গেছেন মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে। আর সেই আন্দোলন কার্যকর করে তুলেছিল এমন একটি আদর্শকে, তিনি ও তাঁর বন্ধু মার্কস ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অগ্রদূত ভোরের হাওয়ার আভাস পেয়ে ১৮৪৮ সালের সূচনায় শ্রমিকদের কাছে একদা ঘোষণা করেছিলেন যার কথা, বলেছিলেন : দুনিয়ার মজদুর এক হও!

তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই যা বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের গতি রোধ করতে পারে।

১৮৯০ সালের ২৮ নভেম্বর আমরা লন্ডনে এঙ্গেলসের সত্তরতম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করেছিলাম। সবচেয়ে খুশির, সর্বাপেক্ষা প্রাণোচ্ছল যৌবনকালে যতখানি তরতাজা, রঙ্গরসিকতায় ভরপুর আর লড়াইখেপা ছিলেন তিনি সত্তর বছরেও ছিলেন তা-ই। আর এর তিন বছর পরে কনকর্ডিয়া-হলে যখন তিনি বার্লিনের শ্রমিকদের বললেন, ‘কমরেডস, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতেও আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করে যাবেন!’ তখন যে হাজার-হাজার মানুষ উৎসাহভরে তাঁর কথা শুনছিলেন এবং ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে দেখছিলেন তাঁকে, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি অবাধ হয়ে বলেননি :

‘এই যুবা পুরুষটির কি ৭৩ বছর বয়স হতে পারে?’

এর পর পুরো দুটো বছরও কাটল না। ১৮৯৫ সালের ৬ আগস্ট ব্রেমেনের বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন উৎসব থেকে ফিরে এসে দেখলাম ফরওয়ার্ডস-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে আমার ডেকের উপর পড়ে রয়েছে এই মর্মান্তিক টেলিগ্রামখানা :

‘গতকাল রাত্রি ১০:৩০-এ জেনারেল মারা গেছেন। দুপুর থেকে অচৈতন্য ছিলেন। দয়া করে ওল্ডেট ও জিঙ্গারকে খবরটা জানান।’

ওল্ডেট (সৈনিক) মানে, আমি।

তার আগেই বসন্তকাল থেকে আমরা, অর্থাৎ জার্মানিতে তিন ব্যক্তি, জানতাম যে ‘জেনারেল’ গলনালির দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তাই এই আঘাত অপ্রত্যাশিত না হলেও এ ছিল বড়ো কঠিন আঘাত, বড়ো ভয়ঙ্কর আঘাত।

এইভাবে নীরব হয়ে গেলেন তিনি, সেই বিরাট পুরুষ, মার্কসের সঙ্গে একত্রে যিনি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, প্রলেতারিয়েতকে শিক্ষা দিয়েছেন সমাজতন্ত্রের রণকৌশল, চব্বিশ বছরের তরুণ বয়সে যিনি রচনা করেছেন ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা শীর্ষক ধ্রুপদী গ্রন্থ, কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর যুগ্ম-রচয়িতা যিনি, কার্ল মার্কসের ‘দ্বিতীয় সত্তা’ এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য পুনঃস্থাপনের দাবি

ঝিনাইদহে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুর ও অপসারণের প্রতিবাদে এবং ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন চত্বরে সংস্কার করে একই স্থানে পুনঃস্থাপনের দাবিতে ২৭ জুলাই '২৬ বিক্ষোভ সমাবেশ' করেছে ঝিনাইদহ জেলা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট।

যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাস্কর্যটি সংস্কার করে পুনঃস্থাপন, ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

২৭ জুলাই ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন ভাস্কর্য চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গণফ্রন্টের জেলা সমন্বয়ক নেহাল আহমেদ সোহেল। এতে বক্তব্য দেন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রাগীব আহসান মুন্না, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের নেতা সাহিদুল এনাম পল্লব, আজিজুর রহমান জালাল, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভতিজা হাফিজুর রহমান, সিপিবি জেলা সভাপতি স্বপন বাগচী, সাধারণ সম্পাদক আবু তোয়াব অপু, বাসদ জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম, জাতীয় গণফ্রন্টের উদয় শংকর বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি শারমিন সুলতানা প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যটি ভাঙচুরের সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও কায়মি



স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী জড়িত। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও ভাস্কর্যের ওপর এই হামলার ঘটনা কোনো আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, বরং এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ও ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। তাই এই হামলার ঘটনায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে ভাস্কর্য অপসারণের যৌক্তিকতা হিসেবে সড়ক নিরাপত্তার যে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সড়ক নিরাপত্তাই মূল কারণ হয়, তাহলে কেন শুধু মুক্তিযুদ্ধের স্মারকগুলোকে টার্গেট করা হচ্ছে? এতে বোঝা যায়, এই যুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপকর্মকে ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সমাবেশ থেকে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য মূল নকশা অনুযায়ী সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করে একই স্থানে পুনঃস্থাপনের জোর দাবি জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ভাস্কর্যটি শুধু একটি শিল্পকর্ম নয়, এটি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর প্রতীক। তাই একে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া বা ভেঙে ফেলার কোনো

সুযোগ নেই। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও স্থাপনাগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী এই স্থাপনাগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা প্রতিটি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে কোনো আপস নয়।

সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের পায়রা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাস টার্মিনাল-সংলগ্ন ভাস্কর্য চত্বরে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। এই মিছিলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী গোষ্ঠী '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান দিয়ে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিস্থাপন করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁদের এই অপচেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করা। তারা মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ও স্মৃতিচিহ্নগুলো

ভেঙে ফেলা ও ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছিল, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার ঘটনাও তারই ধারাবাহিকতা। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই ধারাবাহিক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তারা জাতির ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চায়, কিন্তু তাঁরা কখনো সফল হবে না, কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঙালির রক্তে মিশে আছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও হামিদুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন ক্ষমতার জোরে ভাস্কর্যটি অপসারণ করতে তৎপর। বাম-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে অগ্রাহ্য করে এ লক্ষ্যে একটি পকেট কমিটিও গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। সরকারি দলের ছত্রছায়ায় বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী এবং স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত গোষ্ঠীকে নিয়ে তারা সেই চত্বর দখল করতে চায়। এই পকেট কমিটি কোনো স্বচ্ছ বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফল নয়, বরং এটি একটি চক্রান্তমূলক উদ্যোগ, যা জনমতকে উপেক্ষা করে এগোচ্ছে। এই কমিটির কোনো সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেওয়া যায় না।

মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য বর্তমান জায়গা থেকে না সরানোর জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ও স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসকারী স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, এটি সমগ্র জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে; এই মহান লক্ষ্যকে ব্যাহত করা যাবে না।

অবরোধ করে কিউবাকে ধ্বংস করা হচ্ছে

কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রেনো রদ্রিগেজ পারিলো জাতিসংঘকে বলেন, 'অবরোধ করে আমাদের নীরবে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রেনো রদ্রিগেজ পারিলো ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন।

কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রেনো রদ্রিগেজ পারিলো 'কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধের অবসানের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিতর্কে নিম্নলিখিত ভাষণটি দেন তিনি। এটি ৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে উপস্থাপন করেন এবং ৮ জুলাই কিউবার সংবাদপত্র *এনামা*-তে ছাপা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি সত্ত্বেও, সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিতর্কটি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ১৩৬-৯ ভোটে রায় দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে এই সমাজতান্ত্রিক দেশটির বিরুদ্ধে একটি বৈরী অবরোধ আরোপ করেছিল এবং এই বছর ট্রাম্প প্রশাসন আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মহামান্য অতিথিবৃন্দ, স্থায়ী প্রতিনিধিগণ, সম্মানিত প্রতিনিধিগণ :

কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি বহুমাত্রিক, অপ্রচলিত যুদ্ধ চালাচ্ছে যা প্রায় সাত দশক ধরে চলছে এবং গত সাত মাসে তা আরও নৃশংস ও নির্মম হয়ে উঠেছে।

এখন এর সাথে জ্বালানি অবরোধ যুক্ত করা হয়েছে, যা একটি নৌ অবরোধের সমতুল্য এবং এটি একটি যুদ্ধকালীন পদক্ষেপ। সরাসরি হুমকি, একতরফা জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ এবং এমনকি

মার্কিন নৌবাহিনীর দ্বারা ট্যাংকারগুলোকে হয়রানি বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কিউবায় বাণিজ্যিক ও মানবিক উভয় প্রকার জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বারবার সামরিক আত্মসনের হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং প্রকাশ্য সূত্রগুলোতে যুদ্ধের বিভিন্ন বিকল্প ও প্রস্তুতির বর্ণনা রয়েছে।

অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক অবরোধের পাশাপাশি, অভূতপূর্ব এবং চরমভাবে দেশের সীমানার বাইরের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেমন গৌণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। এই নিষেধাজ্ঞাগুলো কিউবায় একটি মানবিক সংকট উদ্বেগে দেওয়া এবং দেশটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল করার এক বীভৎস পরিকল্পনার অংশ, যা একটি সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশের পথ প্রশস্ত করবে বা তা কার্যকর করতে বাধ্য করবে। এই হস্তক্ষেপ একটি রক্তস্নান এবং কিউবান ও আমেরিকানদের অগণিত প্রাণহানির কারণ হবে।

কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক চাপ আরও তীব্র হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই উত্তর দেন, এবং আমি উদ্ধৃত করছি, 'আমার মনে হয় না, ভেতরে ঢুকে জায়গাটা ধ্বংস করে দেওয়া ছাড়া আর বেশি চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব।'

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আমাদের জনগণের উপর চাপানো মানবিক ক্ষতি বহুগুণে বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মানের অবনতি, জীবিকার হ্রাস, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ সীমিত হওয়া এবং

সম্মিলিত শক্তির অংশ হিসেবে একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের ব্যাপক, নির্লজ্জ ও পদ্ধতিগত লঙ্ঘন।

এগুলো সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়, যা শুধু মনোযোগই নয়, বরং জাতিসংঘ এবং এর সবচেয়ে সার্বজনীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, সাধারণ পরিষদের কাছ থেকে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণাও দাবি করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মানবাধিকারের ভোগ নিশ্চিত করার ম্যান্ডেটের বলে এই ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই

কিউবার পরিবারগুলো, বিশেষ করে শিশু, তরুণ এবং মায়েরা, দীর্ঘস্থায়ী ও অসহনীয় ব্ল্যাকআউট বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দুর্যোগ অনুভব করে। প্রায়শই, যখন বিদ্যুৎ থাকে না, তখন পানীয় জলও থাকে না। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ওষুধ না থাকার যন্ত্রণা তারা জানে। তারা খাদ্য সংকট বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উচ্চমূল্যের ভারে জর্জরিত।

প্রতি হাজার জীবিত জনে ৪.০ শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে ৯.৯ হয়েছে। এর অর্থ হলো, উপযুক্ত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে অন্য পরিস্থিতিতে ১,৭৮০টি নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধ করা যেত।

দেশে ক্যাসারে মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও তরুণদের ক্ষেত্রে, বৈচে থাকার হার ৮৫% থেকে কমে ৬৫% হয়েছে। এই প্রবণতাটি মার্কিন অবরোধের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর সাথে মিলে যায়।

এই অবরোধ নীরবে শ্বাসরোধ করে এবং হত্যা করে। এই নির্মম অপরাধের মোকাবিলা করা জাতিসংঘেরও একটি দায়িত্ব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, এবং বিশেষ করে তার পররাষ্ট্র দপ্তর, এই মিথ্যা ছড়াচ্ছে যে অবরোধটি কিউবার জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে। কিউবার জনগণকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা এই অবরোধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না। এমনকি কিউবায় বসবাসকারী কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বিদেশিদেরও জিজ্ঞাসা করুন।

আমরা পদ্ধতির অপব্যবহার করে মার্কিন প্রতিনিধির নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের কথা শুনেছি। আমি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি, তার কোনোটিরই সমাধান তিনি করেননি।

এটা আশ্চর্যজনক নয়, কারণ তিনি সেই সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন যা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার জন্য দায়ী, যে সরকার কয়েক ডজন সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য দায়ী, এবং যে সরকার লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সবচেয়ে নৃশংস সামরিক একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : গাজা গণহত্যা ও বিক্ষোভকারীদের দমনে জড়িত

এই সেই সরকার, যারা গাজায় চলমান গণহত্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদরত অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের দমনে জড়িত। এই সেই সরকার, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শহরগুলোর সামরিকীকরণ এবং নৃশংস দমনপীড়নের জন্য দায়ী। (ওয়ার্ল্ডস ওয়াল্ড থেকে সংগৃহীত)

শোষণমুক্ত ও সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কমিউনিস্ট ইশতেহার যুক্তি ও শক্তির উৎস

নবম পৃষ্ঠার পর

নিজস্ব কাজ’, তাই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমরা এ নাম বর্জন করার দিকেও যাইনি।

১৮৮৮ সালে ইশতেহার সম্পর্কে এঙ্গেলস লেখেন, বিগত পঁচিশ বছরে আধুনিক শিল্পের বিপুল পদক্ষেপে অগ্রগমন, আর তার অনুসঙ্গী শ্রমিকশ্রেণির উন্নত ও বিস্তৃত পার্টি সংগঠনের প্রেক্ষিতে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, আর তারপরে আরও বেশি করে, প্যারি কমিউনে–যেখানে সর্বহারাশ্রেণি সেই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল–অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। কমিউন একটা কথা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে, তা হলো, ‘তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখল করেই শ্রমিকশ্রেণি নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তা কাজে লাগাতে পারে না’ [ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ : পৃ. ১৫]। অধিকন্তু, একথা স্বতঃস্পষ্ট যে, বর্তমান সময়ের হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনাটা অসম্পূর্ণ, কারণ এতে মাত্র ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত আলোচনার বিস্তার রয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক প্রসঙ্গে মন্তব্যগুলিও চতুর্থ অধ্যায়ে, মূলনীতির দিক থেকে নির্ভুল হলেও, প্রয়োগের দিক থেকে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, আর ইতিহাসের অগ্রগতি সেখানে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশকে দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। ‘কিন্তু, এই ইশতেহার এখন এক ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে, যাকে বদলানোর কোনো অধিকার আর আমাদের নেই।’ [ইশতেহার ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৩৯]

যখন কমিউনিস্ট ইশতেহার লেখা হয়, তখন ইউরোপের কোনো দেশে কমিউনিস্টরা আন্দোলনের শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সকল রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল পুরোনো ইউরোপীয় শক্তি, রাজা-পোপ, রাজনীতিবিদ, পুলিশ–কমিউনিজমের কল্পিত ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত ছিল। তারা কমিউনিজমের উত্থাপিত যুক্তির শক্তিকে ভয় পেত। তাই একজোট হয়ে সবাই কমিউনিজমকে গালাগাল ও মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে নেতাদের দেশ ছাড়া করে দিত।

আধুনিক বুর্জোয়াশ্রেণি হচ্ছে দীর্ঘ বিকাশধারার ফল এবং উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিণতি। উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন হচ্ছে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরাম প্রসারমান এক বাজারের তাগিদে বুর্জোয়াশ্রেণিকে সারা পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে হয়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়।

ইশতেহারে আরও দেখানো হয়েছে, বুর্জোয়াশ্রেণি গ্রামাঞ্চলকে শহরের পদানত, বর্বর দেশগুলোকে সভ্য দেশের এবং প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। তারা সভ্যতার নামে বর্বরতম জাতিদেরও বুর্জোয়া উৎপাদন-প্রণালী গ্রহণে বাধ্য করে। বুর্জোয়াশ্রেণি সকলকেই মজুরিভোগী শ্রমজীবীতে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে নিছক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করেছে। সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃ তান্ত্রিক সম্পর্ক ধ্বংস করে দিয়ে তারা নগ্ন, নির্লজ্জ, পাশবিক শোষণ কায়েম করেছে।

ইশতেহার দেখিয়েছে যে, বুর্জোয়াশ্রেণি বিকাশের যুগে যে প্রগতিশীল ভূমিকা রেখেছিল তা কিছুকাল পরেই প্রতিক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়াসমাজ শ্রেণিবিরোধ দূর করতে পারে না, বরং সমাজবিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখন নতুন বিপ্লবী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে—প্রলেতারিয়েত, আর নতুন সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

ইশতেহারে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন তা খণ্ডন করা হয়েছে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের কোনো দেশ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ‘দেশ’ মূলত বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার একটি রাষ্ট্রযন্ত্র। শ্রমিকরা এই রাষ্ট্রে নাগরিক হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে তার সুবিধাভোগী নয়; তারা মজুরি–নির্ভর, দেশের সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবনযাত্রা সারা বিশ্বে একই রকম শোষণের শিকার। আধুনিক শিল্পশ্রম তাদের ‘জাতীয় চরিত্রের’ সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়েছে। তাই বুর্জোয়া ‘দেশ’–এর প্রতি তাদের কোনো স্বার্থ নেই।

তাই, প্রলেতারিয়েতকে প্রথমে নিজের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং নিজেকে জাতির নেতৃস্থানীয় শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই অর্থে, তাদের সংগ্রাম প্রথমে আকারে জাতীয়। প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণিকেই প্রথমে নিজ নিজ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই জাতীয়তা, বুর্জোয়া অর্থে নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একটি কৌশলগত পদক্ষেপ।

পুঁজিবাদ বিশ্ববাজার ও যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় পার্থক্য ও বিদেশ ক্রমাগত দূর করছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুততর করবে। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য। একজন ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির শোষণ যেমন শেষ হবে, তেমনি এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির শোষণও শেষ হবে।

বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত—পরস্পরের মুখোমুখি এই দুই ভিন্ন শিবিরে গোটা সমাজ ভাগ হয়ে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে বুর্জোয়াশ্রেণি যে অস্ত্র সৃষ্টি করেছিল, তা তার নিজের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়েছে। এই অস্ত্রের সঙ্গেই অস্ত্র ধারণকারী তথা কবর খননকারী

প্রলেতারিয়েতকে সে সৃষ্টি করে। বুর্জোয়াশ্রেণির পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ অনিবার্য।

ইশতেহারের ভাষায়, কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে—‘ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।’ মার্কস–এঙ্গেলস ঘোষণা করেন, পুঁজিবাদী সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য পরিণতি সমাজতন্ত্র। প্রলেতারিয়েত দখল করবে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং কায়েম করবে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব। পৃথিবী এগিয়ে যাবে এক নতুন শ্রেণিহীন কমিউনিস্ট সমাজের দিকে।

কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য হলো—প্রলেতারিয়েতকে সংগঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্য উচ্ছেদ করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। কমিউনিস্টরা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে, কিন্তু কখনো সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্য ভোলে না।

কমিউনিস্টদের সম্পর্কে অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে ইশতেহার। ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের দাবিকে বুর্জোয়ারা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে অভিযোগ করে। কিন্তু পুঁজিবাদে দশ জনের মধ্যে নয় জনের সম্পত্তি উচ্ছেদ হয়ে গেছে। বুর্জোয়া স্বাধীনতা কেবল বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। স্বদেশ বিলোপের অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, ‘মেহনতি মানুষের কোনো দেশ নেই।’

আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণির সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি মাত্র। লেনিন বলেছেন, ‘শ্রমিকশ্রেণির “শাসকশ্রেণিতে রূপান্তর”—এটাই শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব।’ মার্কস লিখেছেন, শ্রেণিসমূহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব এবং তা শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের পথ। এঙ্গেলস বলেন, ‘প্যারিস কমিউনের দিকে তাকান, ওটাই ছিল শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব।’

প্যারিস কমিউন ছিল শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের বাস্তব রূপ, যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। একনায়কত্ব বলতে কোনো ব্যক্তির শাসন নয়, বরং শ্রমিকশ্রেণির শাসনকে বোঝানো হয়েছে।

প্যারিস কমিউনের রূপটি ছিল—সর্বজনীন নির্বাচন ও প্রত্যাহারের অধিকার। কমিউনের কাউন্সিলররা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং তারা স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। যেকোনো সময় ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করতে পারতেন। প্রশাসনিক, বিচারিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত সব পদই ছিল নির্বাচিত এবং প্রত্যাহারযোগ্য।

কমিউনের সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বেতন সাধারণ শ্রমিকের মজুরির সমান নির্ধারণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা বিলুপ্ত করা হয়। এভাবে ‘পদলোভ ও আমলাতন্ত্রের কার্যকর বাধা’ রহিত করেছিল।

কমিউনের প্রথম আইন ছিল স্থায়ী সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে সশস্ত্র জনগণের দ্বারা তার স্থান পূরণ করা। পুলিশকে তার রাজনৈতিক দলের বাহিনী থেকে সরিয়ে কমিউনের কাছে দায়বদ্ধ ও প্রত্যাহারযোগ্য এজেন্টে পরিণত করা হয়েছিল।

কমিউন ছিল ফরাসি সমাজের সমস্ত উন্নত উপাদানের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং একটি প্রকৃত জাতীয় সরকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমাজ কর্তৃক পুনঃশোষিত হয়, অর্থাৎ সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির পরিবর্তে সমাজের নিজস্ব জীবন্ত শক্তিতে পরিণত হয়।

প্যারিস কমিউন ছিল ‘শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব’—এর সেই রূপ, যেখানে রাষ্ট্র ও তার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমাজের কর্তা থেকে সমাজের সেবকে পরিণত হয়েছিল। এটি ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় একটি ‘নতুন ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক’ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা।

‘আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। প্রকাশ্যেই তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণিরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারানোর কিছু নেই। জয় করার জন্য আছে সারা বিশ্ব। দুনিয়ার মজদুর এক হও!’

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের পর পৃথিবীর পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক। একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তির বিশাল অগ্রগতি, অন্যদিকে মানুষের ওপর শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি—দুটোই ঘটছে। বাজার দখলের জন্য সম্রাজ্যবাদীরা দুইটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, আবার সমাজতন্ত্র কিছুদিনের জন্য হলেও মানবজাতির বিকাশের পথ কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছে। আজ সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-উন্মাদনার কবলে বিশ্ব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চরম ধনী আর ভয়াবহ দারিদ্র্য—এই বৈষম্য কোনাভাবেই ঢেকে রাখতে পারছে না। কখনো ধর্ম, কখনো উগ্র আক্রমাত্মক জাতীয়তাবাদ, কখনো আঞ্চলিকতা—যখন যা ব্যবহার করা যায় তাই দিয়েই পুঁজিবাদ শোষণকে আড়াল করতে চাইলেও তার মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই এই প্রশ্ন তাড়িত করছে যে, মানুষের মুক্তি কোন পথে আসবে? কোন ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে বিশ্ব—এই প্রশ্ন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহার একদিকে যেমন পুঁজিবাদের উদ্ভব ও প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছে, তেমনি ভবিষ্যতের পথনির্দেশ আছে এর মধ্যেই। ফলে আগামীর শোষণ-বৈষম্যহীন, মানবিক ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা এক বিশাল যুক্তি ও শক্তির উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করছে এবং করে যাবে আরও বহুদিন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

অদिति ইসলাম আহ্নায়ক ও মিনহাজুল ইসলাম ফারহান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২১তম কাউন্সিল ২০ জুলাই ’২৬ মধুর ক্যান্টিনের গোলঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্নায়ক সুহাইল আহমেদ শুভ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস ও ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয়

কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জাতীয় স্বার্থপরিপন্থি চুক্তি সম্পাদন করে দেশকে সম্রাজ্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ করার হীনচেষ্টা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করেছে নির্বাচিত সরকার ও অক্ষুণ্ন রাখছে।

উচ্চশিক্ষার ওপর নিত্যানতুন পন্থায় নেমে আসা বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণের আক্রমণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণচরিত্রকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে। শিক্ষায় নেই পর্যাণ্ড বাজেট। জ্ঞানচর্চার পরিপূরক আয়োজনের ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদের জন্য মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় আয়োজন—আবাসন, খাদ্য, শারীরিক ও

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা—কোনোটাই পর্যাণ্ড তো নয়ই, বরং প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। বহুল আকাক্ষিত শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোও শাসকদের ভাবনার বাইরে অবস্থান করছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনেও রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। গবেষণা খাতে বরাদ্দ প্রায় শূন্যের কোটায়। এতদিন পর্যন্ত যতটুকু বরাদ্দ ছিল, এবারের বাজেটে তার নিয়ন্ত্রণের ভার ইউজিসি-এর ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে মুক্তচিন্তার পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেনি। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চাকে একটি সীমার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে যা উদ্বেগজনক।

কাউন্সিল এসব সংকট নিরসনের দাবি নিয়ে আগামী দিনে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দেয়। একইসঙ্গে কাউন্সিল সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গণবিরোধী পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে ৬ সদস্যবিশিষ্ট ২২তম কমিটি নির্বাচিত করে।

নবনির্বাচিত কমিটি : আহ্নায়ক : অদिति ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক : মিনহাজুল ইসলাম ফারহান; সদস্যবৃন্দ : ১. বন্যা সরকার, ২. শিশির রুদ্ৰ, ৩. হুদিতা ইসরাত রাব্বানী ও ৪. লিয়ামনি

বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার ত্রাণ সহায়তা প্রদান

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট



জুলাই ২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহে ভারী মৌসুমি বৃষ্টি এবং উজানের ঢল, নদী ভরাট-দখলের কারণে পানি প্রবাহে যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকা, জোয়ারের প্রভাব, শহরে খাল বন্ধ, অপরিষ্কৃত

নগরায়ণ, ড্রেনেজ সিস্টেমের সমস্যার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যায় প্রায় ১১টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ১১ লাখের

বেশি মানুষ আক্রান্ত হন। জলাবদ্ধতার কারণে এইচ এস সি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে। আক্রান্ত মানুষের সহায়তায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকা,

মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে। কয়েকটি জেলার খণ্ড চিত্র উপস্থাপন করা হলো। এই বন্যা যেমন প্রকৃতিক তেমনি মানব সৃষ্ট ছিল।

বন্যায় দুর্ভোগের বাস্তবতা

বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে সরকারের দায়িত্ব বোধের একটি পরীক্ষা হয়ে গেল। গত কিছুদিনে মৌসুমি বৃষ্টিতে ঢাকায় অসহায়ত্ব, অপমান আর আন্দোলনের জটিল চিত্র তৈরি হয়েছে। অসহায়ত্ব নগরবাসীর, কারখানাশ্রমিক ও কর্মচারীর—বিশেষত নারী ও শিশুদের। এ শহরে যেন বৃদ্ধ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীর জায়গা নেই। তারা উপেক্ষিত সব ক্ষেত্রে। কিন্তু যারা সক্ষম এবং কর্মরত, তাদের বিষয়ে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ভাবনা কই? অফিস যাত্রী, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী এবং নগরবাসী বৃষ্টি আর জমে থাকা পানি পার হয়ে কীভাবে তারা যাতায়াত করবেন? তা দেখা এবং দায় নেওয়ার কেউ নেই! পানি জমে আছে প্রধান সড়কে, গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। একদিকে হাটপানি অতিক্রম করে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার কষ্ট, অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রীর কথায় শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বিক্ষোভ করছে। শিক্ষার্থীরা দাবি করছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং জলাবদ্ধতার কারণে তাদের পরীক্ষা স্থগিত করা হোক। তাদের দাবি, পরীক্ষা স্থগিত করার কারণ জলাবদ্ধতা এবং প্রবল বৃষ্টি। দাবি উঠেছে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। এরপর মন্ত্রী সংসদে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং পরীক্ষা স্থগিতের দাবিতে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি পালন করছে। যদিও একটু থেমেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। আগামীতে মে, জুন, জুলাই মাসে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না, তা জরুরিভিত্তিতে ভেবে দেখা দরকার। এই কারণে এটি প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আন্দোলনের সুযোগ না পায়। এর ফলে সরকার দৈনন্দিন জরুরি কাজ থেকে দূরে সরে চলে যেতে পারে। প্রকারান্তরে সমস্যা প্রত্যেকের। সব পক্ষকে সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

ঢাকা যতটা গর্বের, ঠিক ততটা দুর্ভোগের। কয়েকদিনের ঢাকা শহর যেন জলবন্দি নাগরিকদের দুর্ভোগের শহর। মহানগরের চারদিকে বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা, তুরাগ-বালু নদী এবং শহরের চারপাশে বিস্তীর্ণ নিচু এলাকা যা প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে কাজ করে। কেন জলাবদ্ধতা? উত্তর জানা থাকলেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেনি কেউ; বরং জায়গা পেলে দখল করেছে ক্ষমতাসীনরা। নদীগুলো সংকীর্ণ, খাল দখল আর নিচু এলাকা ভরাট করার প্রতিযোগিতায় অনেকে এগিয়ে। নগরবাসী হারিয়েছে নাগরিক সুবিধা। ঢাকার নাম প্রায়ই উঠে আসে বসবাসের অযোগ্য শহরের

তালিকায়। বাতাস দূষিত, ধূলিকণা আর ভারী ধাতব কণা মেশানো। পানির মান খারাপ। সব নাগরিক ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি পায় না। যারা পায়, তাদের অভিযোগ পানির মান ও পরিমাণ নিয়ে। অল্প বা ভারী বৃষ্টি হলে ডুবে যায় সড়ক। প্রধান সড়কের পানি কয়েক ঘণ্টায় সরলেও অলিগলিতে পানি নামতে সময় লাগে। টানা বৃষ্টিতে এই ভোগান্তি আরও বেড়েছে। ভোগান্তি কেন, চলছে দায় চাপানোর খেলা। কার ঘাড়ে কে দায় চাপাবে, সেই চেষ্টা যত আছে, সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ঠিক ততটাই উপেক্ষিত। এভাবে কি মূল সমস্যা সমাধান খুঁজে পাবে? সিটি করপোরেশন বলছে, নগরবাসী ড্রেনে অতিরিক্ত বাড়ির কঠিন বর্জ্য ফেলার কারণে ড্রেনগুলো সচল থাকছে না।

অন্যদিকে জলাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ড্রেনেজের পাশাপাশি রাজধানীর জলাবদ্ধতার বড় কারণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা। খাল-সুইসগেট, পাম্প স্টেশন ও ড্রেনেজ অবকাঠামোর বড় অংশ ঠিকমতো কাজ করছে না। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, যন্ত্রপাতির অচলাবস্থা এবং বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতার কারণে প্রতি বছর একই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে। নষ্ট হচ্ছে সময়, অর্থ ও সম্পদ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বৃষ্টির পানি নদীতে নিষ্কাশনের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো ৪১টি সুইসগেটের মধ্যে মাত্র ১৯টি কার্যকর রয়েছে। বাকি ২২টির মধ্যে ছয়টি সম্পূর্ণ অচল ও ১৫টি আংশিক সচল থাকলেও কার্যকরভাবে পানি নিষ্কাশনে ভূমিকা রাখতে পারছে না। আবার এসব সুইসগেট পরিচালনার জন্য সিটি করপোরেশনের নিজস্ব পর্যাপ্ত জনবলও নেই। একই সঙ্গে রাজধানীর আটটি প্রধান পানি নিষ্কাশন আউটলেটের তিনটি বড় পাম্পের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল রয়েছে। অন্য পাম্পগুলোও পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করতে পারছে না। ড্রেনে জমে থাকা বর্জ্য দ্রুত অপসারণের জন্য দুই সিটি করপোরেশনের পাঁচটি সাকার মেশিনের মধ্যে একটি দীর্ঘদিন ধরে অচল। মাটি ও আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার না করায় দুই সিটির আওতায় থাকা ২৬টি খালের বড় অংশ পানি বহন ও পানিপ্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা হারিয়েছে। তাহলে বৃষ্টি এবং বর্ষার পানি যাবে কোথায়?

সিটি করপোরেশন সূত্র বলছে, প্রায় ৩০৬.৩৮

বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১২৯টি ওয়ার্ডে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের বসবাস। অথচ এই বিশাল এলাকার বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য কার্যকরভাবে নির্ভর করতে হয় মাত্র আটটি আউটলেটে। মালিবাগ-শান্তিনগর, পল্টন ও মতিবিল এলাকার পানি টিটিপাড়া পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। পুরান ঢাকা, আজিমপুর, গুলিস্তান ও হাজারীবাগ এলাকার পানি ধোলাইখাল-সূত্রাপুর হয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে যায়। গ্রিনরোড, তল্লাবাগ ও পান্থপথ এলাকার পানি হাতিরবিল হয়ে রামপুরা পাম্প স্টেশনে পৌঁছায়। আশুলিয়া এলাকার পানি গোড়ান-চটবাড়ি এলাকা দিয়ে, এয়ারপোর্ট এলাকার পানি আব্দুল্লাহপুর আউটলেট দিয়ে এবং শ্যামলী-মোহাম্মদপুর এলাকার পানি কল্যাণপুর এলাকা দিয়ে যায়। আর যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, জুরাইন ও ডিএনডি এলাকার কিছু অংশের পানি শিমরাইল পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা নদীতে নিষ্কাশন করা হয়। এর মধ্যে হাতিরবিল পরিচালনা করে রাজউক; কল্যাণপুর ও রামপুরা আউটলেট পরিচালনা করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন; ধোলাইখাল ও কমলাপুর-টিটিপাড়া আউটলেট পরিচালনা করে ডিএসসিসি; আব্দুল্লাহপুর ও গোড়ান-চটবাড়ি এলাকার আউটলেট পরিচালনা করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং শিমরাইল আউটলেট পরিচালনা করে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন। এদিকে কমলাপুর স্টেডিয়ামসংলগ্ন টিটিপাড়া পাম্প স্টেশন দিয়ে প্রতি মিনিটে প্রায় ৮ লাখ ৫৫ হাজার লিটার পানি অপসারণের সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তিনটি বড় পাম্পের মধ্যে একটি প্রায় দেড় বছর ধরে বিকল।

সম্প্রতি নতুন পাম্প কেনার জন্য দরপত্র সম্পন্ন হলেও চলমান বর্ষা মৌসুমে সেটি সচল করা হয়নি। আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে মেগাসিটি ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে এত কম সংখ্যক আউটলেট যথেষ্ট নয়। অথচ পাঁচ দশক আগেও নগরীতে যে কয়টি আউটলেট ছিল, এখনো সে কয়টি আউটলেটের মাধ্যমেই পানি নিষ্কাশন হচ্ছে। ধোলাইখালের তিনটি পাম্প সচল থাকলেও টিটিপাড়ার তিনটি পাম্পের মধ্যে একটি নষ্ট রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, নতুন পাম্প সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনার কথা শুনে নগরবাসী আশ্বস্ত হতে পারে না। এত খরচ করে তৈরি করা সুইসগেটের অধিকাংশ

অকেজো। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। ডিএসসিসির প্রকৌশলীদের দাবি, ওয়াসা থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডে হস্তান্তরের পর দীর্ঘদিন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় সুইসগেটগুলোতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

নগর পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বর্তমান বাস্তবতায় মেগাসিটির জন্য সাতটি আউটলেট যথেষ্ট নয়। পানির যে চাপ তৈরি হয়, তা মোকাবিলা করতে হলে যে সুইসগেটগুলো আছে, সেগুলো কার্যকর রাখতে হবে এবং আরও সুইসগেট বাড়াতে হবে। এত বড় শহর আর বিপুল জনগোষ্ঠীর বসবাস যেখানে, যে শহর দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত, সেই শহরের পানি ও বর্জ্য নিষ্কাশন সমস্যা কি এডহক ভিত্তিতে অথবা ধরো-তজ্জা-মারো-পেরেক পদ্ধতিতে সমাধান হবে? রাজধানীর জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ ড্রেনেজ লাইনে জমে থাকা বর্জ্য ও রকেজ। নগরবাসীর নিয়মিত পলিথিন, প্লাস্টিক, রাবার ও স্পঞ্জ ফেলায় ড্রেন দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। অনেক এলাকার পানি দীর্ঘপথ ঘুরে নদীতে পৌঁছায় বলেও জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, পানি নিষ্কাশনের পথ সংক্ষিপ্তকরণ, অকার্যকর সুইসগেট মেরামত, পাম্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং নতুন সাকার মেশিন সংযোজন করলে আটকে থাকা পানি বের করে দেওয়া সম্ভব। সমস্যায় ভুগছেন নগরবাসী, কারণ চিহ্নিত হয়েছে, সমাধানের পথও জানা আছে, তারপরও কেন সমাধান হয় না? সারা দেশ দূরের কথা, যেখানে রাজধানী ডুবে যায় বৃষ্টির পানিতে, সেখানে বন্যা এবং পাহাড়ি ঢল ঠেকানোর দায় কে পালন করবে? বন্যার পানির মতোই পরিকল্পনার নামে টাকা খরচ করা তো চলছে, নাকি বন্ধ হয়েছে? এটি শতভাগ সত্য, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাড়ছে মানবসৃষ্ট বিপর্যয়। প্রতিবার বন্যায় এই প্রশ্নই জাগে, জনজীবনের দুর্ভোগ কি কোনোদিনও সমাধানে আসবে না? কবে আসবে, আমরা তাও জানি না। তবে সরকারের কাছে আমরা চাই, সূর্য পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের দুর্ভোগ কমিয়ে আনুন। মানুষ দেখুক, আপনাদের চেষ্টার কমতি ছিল না। সমস্যা যতই থাকুক, সমাধানের আন্তরিক চেষ্টাই একদিন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা নিয়ে আসতে পারে। এই সমস্যা শুধু রাজধানী ঢাকা শহরের-ই নয় সারা দেশের অবস্থা একই।

শোষণমুক্ত সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্ট ইশতেহার যুক্তি ও শক্তির উৎস

কমরেড খালেকুজ্জামান

মানবজাতি এবং মানবসমাজ কোনোটাই স্থির নয়। প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-গতি এবং পরিবর্তনের মধ্যেই আছে বলে সমাজ বিকাশমান। এই বিকাশের ধারা বুঝতে এবং গতির কারণ জানতে যে পুস্তিকা এখনও সারা পৃথিবীতে আলোচিত তার নাম কমিউনিস্ট ইশতেহার। গণ অভ্যুত্থানের পর আবার যখন হতাশা ঘিরে ধরছে দেশের মানুষকে, তখন সমাজের বিকাশের নিয়ম জানা, তার আলোকে সমাজ ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের জন্য বাসদের পক্ষ থেকে সারাদেশে আঞ্চলিক ও বিভাগীয় শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গত ২৬ ও ২৭ জুন : ঢাকায়, জোন-৬; ও গোপালগঞ্জে জোন-৭; ৩ ও ৪ জুলাই : কুষ্টিয়ায় জোন-৩ ও ৪; ১০ ও ১১ জুলাই : জয়পুরহাটে জোন ১ ও ২; ময়মনসিংহ জোন-৫; লক্ষ্মীপুরে জোন-১০; ১৭ ও ১৮ জুলাই : সিলেটে জোন-৯; চট্টগ্রামে জোন-১১; এবং ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট : বরিশালে জোন-৮ এর শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ও কমিউনিস্ট সংগঠনের মূলনীতির ওপর অনুষ্ঠিত এসকল শিক্ষাশিবিরে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। শিক্ষাশিবিরগুলোতে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হলো। এছাড়াও এই সকল শিক্ষাশিবিরে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন-সহ কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের নেতৃবৃন্দ ও জোনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, এখন থেকে ১৭৮ বছর আগে ১৮৪৭ সালে ইউরোপের একটি রাজনৈতিক সংগঠন ‘কমিউনিস্ট লিগ’ ইশতেহার লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে। জার্মান ভাষায় তাদের রচিত এই ইশতেহারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, ‘ইশতেহারের মধ্যে যে মূল চিন্তাধারা প্রবহমান তা হলো এই—প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও তা থেকে আবশ্যিকভাবে সমাজের যে কাঠামো উদ্ভূত হয় সেটাই গঠন করে ওই যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের ভিত্তিভূমি। ফলস্বরূপ (জমির ওপর আদিম গোষ্ঠীগত মালিকানার অবলুপ্তির পর থেকে) অর্থাৎ মানবজাতির লিখত সমগ্র ইতিহাসই হয়ে এসেছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষিত ও শোষকদের মধ্যে, আধিপত্যধীন ও অধিপতিশ্রেণির মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু এই সংগ্রাম এখন এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে শোষণ-নিপীড়ন ও শ্রেণিসংগ্রাম থেকে সমগ্র সমাজকে চিরদিনের মতো মুক্ত না করে, শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিটি (সর্বহারাশ্রেণি) তাকে শোষণ ও নিপীড়ন করছে যে শ্রেণিটি (বুর্জোয়াশ্রেণি) তার হাত থেকে নিজেকে আর মুক্ত করতে পারে না। সুতরাং জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার অনিবার্যভাবে আসন্ন অবসানের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই বইয়ের লক্ষ্য।’

সমাজজীবন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ইশতেহার এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। যে পদ্ধতি ছিল—ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি। এর মূল কথা হলো : এই



পদ্ধতির মধ্যদিয়ে একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের বিরোধগুলি উদ্ঘাটন করে এবং এর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে দেখিয়ে দেয়; পুরোনো সামাজিক সম্পর্কসমূহ ধ্বংস এবং নতুন সম্পর্কগুলি সৃষ্টি করতে সক্ষম সামাজিক শক্তিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের মুখ্য ঝোঁক, প্রকৃতি ও পদ্ধতিসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়।

ইশতেহার লেখার প্রেক্ষাপট হলো, ১৮৪৭ সালে ‘ন্যায়পরায়ণদের লিগ’ ও ‘ব্রাসেলস কমিউনিস্ট কনগ্রেসপন্ডেন্স কমিটি’ কংগ্রেসে একীভবনের মাধ্যমে ‘কমিউনিস্ট লিগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়পরায়ণদের লিগ ছিল একটি গোপন সংগঠন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক। অন্যদিকে, ব্রাসেলস কমিটি ছিল কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। জোসেফ মলের মাধ্যমে উভয় পক্ষের আলোচনার পর তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তার সঙ্গে একমত হন। মার্কস ও এঙ্গেলস লিগে যোগ দেন, যার কর্মসূচি ছিল কমিউনিস্ট। প্রলোভনীয়তের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন ‘কমিউনিস্ট লিগ’-এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি হিসেবে ইশতেহার রচিত হয়। ইশতেহার রচনাকালে তাদের ব্রাহ্মবাদী, প্রকৃতিবাদী, লাসালপন্থি, ভাইটলিং-এর খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রসহ বিভিন্ন পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি এবং বুর্জোয়াদের তোলা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিয়ে এই দলিলটি লিখিত হয়।

‘কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার’ শীর্ষক ছোট্ট এই পুস্তিকাটি শ্রমিকশ্রেণির নতুন দুনিয়ার মতাদর্শের এক অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক হাতিয়ার। বর্তমানে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত, সবচেয়ে আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন রচনা, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশের কোটি কোটি শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি। সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট বা ওয়ার্কাস পার্টিগুলোর দিকনির্দেশক মহত্তম দলিল হিসেবে তা প্রকাশের পর আজও সমানভাবে স্বীকৃত গুরুত্ব বহন করছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের উদ্দীপনার পেছনে এই গ্রন্থের ভূমিকা আজও সমপরিমাণে অটুট আছে।

ইশতেহার রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখার শুরুতেই বলা হয়েছে—‘এটাই যথার্থ সময় যখন কমিউনিস্টদের উচিত সারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা কী তাদের মতামত, কী তাদের লক্ষ্য, কোন দিকে তাদের ঝোঁক, আর কমিউনিজমের ভূতের এই ছেলে ভুলানো গল্পের জবাব দেওয়া উচিত নিজেদের একটা ইশতেহার প্রকাশ করে।’

ইশতেহার প্রকাশের বছর ইউরোপের দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল। একদিকে পুরোনো রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, অন্যদিকে উদারপন্থি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে গোটা

মহাদেশটি যেন এক বিপ্লবের উত্তাল ক্ষেত্র। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ঝড় ওঠে, কিন্তু শাসকদের দমননীতির ফলে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তবে আন্দোলন পুরোনো শাসনব্যবস্থাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস ওই সময় জার্মানিতে এসে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েন।

লেনিন কমিউনিস্ট ইশতেহার সম্পর্কে লিখেছেন—এই বইটিতে নতুন জগতের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে প্রতিভাসম্পন্ন স্পষ্টতা ও চমৎকারিত্ব সহকারে; উপস্থাপিত হয়েছে এক নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, তুলে ধরা হয়েছে সুসমঞ্জস্য বস্তুবাদ, যা সমাজজীবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; তুলে ধরা হয়েছে বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য ও সূচিক্রিত মতবাদ হিসেবে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে; আর উপস্থাপিত হয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব ও নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা-সর্বহারাশ্রেণির বিশ্ব-ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক ভূমিকার তত্ত্ব।

এঙ্গেলস লিখেছেন—‘প্রকাশের পর থেকে এটি সারা দুনিয়া ঘুরছে, প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত নানান দেশের সর্বহারা আন্দোলনের এটি পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।’ ফেডারেশন অফ দি জাস্ট-এর আদর্শ ছিল ‘সব মানুষ ভাই’; তার বদলে নতুন শ্লোগান হলো ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও।’

ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সারা দুনিয়ায় চিন্তার জগতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। এখনো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে পথ দেখিয়ে চলেছে এই ইশতেহার।

ইশতেহারে পুঁজিবাদের জন্ম-বিকাশ ও আকাশচুম্বী উৎপাদন সক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়েছে; একই সঙ্গে দেখানো হয়েছে তার অন্তঃস্থ সহজাত সংকটের চেহারা এবং বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকা গভীর শ্রেণিদ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা। পুঁজিবাদ অকল্পনীয়ভাবে পণ্যোৎপাদন বাড়ালেও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারেনি।

অর্থনৈতিক বিকাশ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বৃদ্ধি এমন এক স্তরের পৌঁছায় যখন উৎপাদন সম্পর্ক সমাজঅগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিরোধ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। ইশতেহারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ওপর হিংস্র শোষণের আসল রূপ উন্মোচিত করা হয়েছে। পুঁজি মানুষের মানবিক সম্পর্ক, মানুষের মর্যাদা, জ্ঞান-দক্ষতা সবকিছুকেই বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত করে। কেবল নগ্ন ব্যক্তিগত ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ-সুন্দর সম্পর্কের কিছুই যে পুঁজি অবশিষ্ট রাখে না বা রাখতে পারে না, তারই ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে ইশতেহারে। পুঁজিবাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কথা প্রমাণ করলেও ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস যুক্তি দিয়ে দেখান যে, এই পুঁজিবাদ নিজে নিজে ধ্বংস হবে না। পুঁজিবাদের কবর খোঁড়ার জন্য দ্বন্দ্বিক বিচারধারা অনুসারে কোনো একটি শ্রেণিকে ভূমিকা রাখতে

হবে। এবং সেই শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে, আর সেই শ্রেণিই হলো—শ্রমিকশ্রেণি বা সর্বহারাশ্রেণি, যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই কিন্তু জয় করার জন্য আছে সমস্ত পৃথিবী। আরও একটি কারণে ইশতেহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কেন কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে, মার্কস ও এঙ্গেলস সে কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ‘একদিকে কমিউনিস্টরা হলো বাস্তবিক অর্থে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলোর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ—যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যায়; অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে বৃহত্তর সর্বহারা জনতার অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে সর্বহারা আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে।’

কমিউনিস্ট লিগ প্রতিষ্ঠার পর ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান ফরাসি বুর্জোয়ারা চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করে। সর্বহারাশ্রেণি ও বুর্জোয়াশ্রেণির মধ্যে এটাই ছিল প্রথম গৃহযুদ্ধ। পরাজয়ের পর ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে যায়। সর্বহারা আন্দোলনে জীবনসম্পদন তখনও যেখানেই দেখা যেত সেখানেই তা দমন করা হতো নির্মমভাবে। সে সময় কোলোন শহরে অবস্থিত কমিউনিস্ট লিগের কেন্দ্রীয় দপ্তরে হামলা চালায় প্রুশিয়ান পুলিশ। সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর শুরু হয় বিখ্যাত ‘কোলোন কমিউনিস্টদের বিচার পর্ব’। বিচারে কমিউনিস্টদের দণ্ড দেওয়া হয়। এর পরেই অন্যান্য সদস্যরা ১৮৫২ সালে পাঁচ বছরের মাথায় এই সংগঠনটির অর্থাৎ, কমিউনিস্ট লিগ-এর অস্তিত্ব বিলোপ করেন। আর ইশতেহার সম্পর্কে বলতে গেলে তখন মনে হয়েছিল সেটা বুঝি বিশ্বস্তির গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণি যখন আরও একটা আঘাত হানার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করল, তখন আবির্ভাব ঘটল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির (International Working Men's Association)। অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সর্বহারারা গৌরবময় স্মৃতিমণ্ডিত আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতিতে একত্রে হাত মিলিয়েছিল ১৮৬৪ সালে, যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত। একথা সত্য, আন্তর্জাতিক টিকে ছিল মাত্র নয় বছর। ইশতেহার আবার সর্বসমক্ষে নতুন করে দাঁড়িয়েছে। ১৮৬৬ সালে সমিতির জেনেভা কংগ্রেসে মার্কসের ‘Instructions for the Delegates of the Provisional Central Council’ পাঠ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম, আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের আইনি প্রবর্তন, শিশু ও নারীশ্রম, সমবায়ী শ্রম এবং ট্রেড ইউনিয়ন। আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবির পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক উৎসব হিসেবে প্রতি বছর পহেলা মে উদ্‌যাপনের জন্য সকল দেশের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানানো।

কমিউনিস্ট ইশতেহার নামকরণ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছেন, ১৮৪৭ সালের পূর্ব থেকে ইউরোপে সমাজতন্ত্র ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির আন্দোলন, আর কমিউনিজম ছিল শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। সমাজতন্ত্র ছিল ভদ্রস্থ ব্যাপার, কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর সেহেতু প্রথম থেকেই আমাদের ধারণা ছিল যে ‘শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিকশ্রেণির এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

অভ্যুত্থানেও পরিবর্তন নেই : উন্নয়নের মধু খেয়ে ফেলছে দুর্নীতি

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? কেউ বলবেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর ফলে প্রভাব পড়ছে ব্যবসাবাণিজ্য, উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানিসহ জনজীবনে। কেউ বলবেন, সম্পদ কম কিন্তু মানুষ বেশি-কীভাবে সম্ভব দেশকে পরিচালনা করা? বিশেষজ্ঞরা বলবেন, জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাব সবখানে। আর কেউ বলবেন, মানুষ কাজ করে না। শেষে কেউ বলবেন, কিছু ব্যবসায়ীর লুটপাট, মাদক-মাস্তানি আর সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট চক্র। যদিও এর কোনোটাই ছোট সমস্যা নয় এবং এদের প্রভাবে মানুষের 'ত্রাহি' অবস্থা। কিন্তু সব সমস্যা যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে একটি সংকটে-সেটি হচ্ছে সর্বত্র দুর্নীতি। এমনকি তা সরষের মধ্যে ভূতের মতো, দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যেও। মাঝে মাঝে দু-একটা খবর বেরিয়ে আসে, যা মানুষকে আশ্বস্ত তো নয়ই, বরং আতঙ্কিত করে। মানুষ ভাবে, তাহলে যাব কোথায়?

একটা সময় ঘুষ খাওয়া চলত গোপনে। তা প্রকাশ পেলে আশপাশের মানুষ বলত, 'উনি ঘুষ খান।' এটা ছিল লজ্জার। তারপর ধীরে ধীরে ঘুষ খাওয়াটা বাড়তি আয়ে পরিণত হলো। কোন চাকরি কতটা ভালো, তার বিচার হতো উপরি আয় আছে কিনা, তা দিয়ে। এটা এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে, মেধার যাচাই করে যে চাকরি দেওয়ার পদ্ধতি-যাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা বা বিসিএস পরীক্ষা বলি-সেই পরীক্ষায় পছন্দের তালিকায় সেই ক্যাডারগুলো লোভনীয় যেখানে ক্ষমতা এবং দুর্নীতির সুযোগ বেশি। ক্ষমতার কী মূল্য আছে, যদি দুর্নীতি করে টাকা রোজগার করা না যায়? ফলে মেধা, ক্ষমতা এবং দুর্নীতির মিলবন্ধন এখন লুকানো বিষয় নয়। সেবাখাত বলে যা প্রচারিত-তা ঘুষের আখড়া। একজন প্রতিযশা অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ঘুষ বলবেন না, বলুন স্পিড মানি'-যা কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। অর্থনীতির দুর্নীতির কথা এখন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; এখন বিবেচনা করতে হবে দুর্নীতি-অর্থনীতির কথা।

২০২৪-এর অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী স্লোগান ছিল প্রকাশ্যে। কিন্তু তার অন্তরালে ছিল দুর্নীতির হাত থেকে দেশ বাঁচানোর আকুতি। দেশের কোটি কোটি মানুষ ঘাম বরিয়ে উৎপাদন করে, বিদেশে পরিশ্রম করে দেশে ডলার পাঠায়; আর একদল মানুষ দেশের মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে, বিদেশে টাকা পাচার করে। গরিব শ্রমজীবীরা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় দেশে। আর ধনীরা টাকা পাচার করে বিদেশে। অথচ তারাই হয় দেশপ্রেমিক।

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তারা বেতন নেয়, ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে। এসব দেখে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দেয়। একদল অন্যান্য সুবিধা নেওয়ার জন্য যেমন ঘুষ দেয়, অন্যদিকে বেশিরভাগ মানুষ তার কাজটা যেন হয়, এই আশায় ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এর বিপরীতে একটা ন্যায্যভিত্তিক সমাজের আশায় দেয়ালে স্লোগান লেখা হয়েছিল, 'ঘুষ চাইলে ঘুষি দেবেন।' কিন্তু ওই যে ক্ষমতা আর দুর্নীতি হাত ধরাধরি করে চলে? তাই অভ্যুত্থানের পর যারা ক্ষমতায় এলেন, তাদের কয়েকজন সেই পুরনো পথে হেঁটেছেন। টিআইবির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনই এর সত্যতা উন্মোচন করেছে।

বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জনগণের অনেক আশা ছিল। তারা একটা নতুন পথে প্রশাসন-বিচার, পুলিশ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করবেন। যেহেতু তারা কোনো বিপ্লব করেননি, তাই কোনো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ আশা করেননি কেউ। পুরনো পথেই দেশকে চালানো হয়েছে, শুধু ক্ষমতাসীনদের চেহারা বদলে গেছে। এই বিতর্ক চলছে এখনো এবং চলবে বহুদিন। কিন্তু জনগণ তো পরিবর্তন চেয়েছিল, রাস্তায় নেমেছিল, জীবন দিয়েছে-এই সত্যকে মুছে ফেলা যাবে না। যেহেতু ব্যবস্থা বদল করার ইচ্ছা ক্ষমতাসীনদের ছিল না, তাই তারা ব্যবস্থার সুবিধা নিতে চেয়েছে এবং পুরনো শাসকদের প্রতি জনগণের ক্ষোভ কাজে লাগিয়েছে। ১৮ মাসের খতিয়ান দেখলে এই লজ্জাকর চিত্র ফুটে ওঠে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরছে। শাসকশ্রেণির দলগুলো ক্ষমতার বাইরে থাকলে টিআইবির প্রতিবেদনকে বাহবা দেয়। কিন্তু কোনো ক্ষমতাসীন সরকার তাদের প্রতিবেদন গ্রহণ করে না, বরং ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং অসং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণ মনে করে, প্রতিবেদন ঠিক আছে; বরং দুর্নীতি আরও বেশি, যার পুরো চিত্র উঠে আসেনি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত-এক বছরে বিভিন্ন সেবাখাতে মোট ১২ হাজার ৬৩৩ কোটি ২০ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। 'সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫' শীর্ষক এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য তুলে ধরে তারা দেখিয়েছে, দুর্নীতি দূর হয়নি, কমেনি, বরং ধারাবাহিকতা থেকেছে। তাদের

জরিপে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) নমুনাকাঠামো ব্যবহার করে দেশের আটটি বিভাগের গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে দুই ধাপে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ১ হাজার ১৪৯টি এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ১৮টি সেবাখাতের চিত্র তুলে ধরেছে তারা। এবারই প্রথম নয়, এর আগেও ২০২৩ সালে জরিপ করেছিল টিআইবি।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালের মতো ২০২৫ সালেও পাসপোর্ট (৭৬.৬ শতাংশ) ও বিআরটিএ (৬৩.৫ শতাংশ) থেকে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে। ঘুষ ও দুর্নীতির তালিকায় এরপর রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, কৃষি-ভূমি ও বিচারসংশ্লিষ্ট সেবাখাত। এসব খাতে গড় ঘুষের পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। টিআইবির জরিপে অংশ নেওয়া ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবার মনে করে, ঘুষ ছাড়া সেবা পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবায় ঘুষ ও দুর্নীতির উচ্চহার মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বাধা। পাশাপাশি কৃষি, স্থানীয় সরকার-ভূমি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পাসপোর্ট ও বিআরটিএ খাতে দুর্নীতির প্রবণতা বেড়েছে বা আগের মতো রয়ে গেছে।

একটা বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ দুর্নীতিকে মেনে না নিলেও প্রতিবাদ করার মানসিকতা পোষণ করে না। কারণ সে মনে করে, এতে তো তার কাজ হবেই না, বরং বিপদে পড়বে। তাই দুর্নীতির শিকার হয়েও ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ পরিবার কোনো অভিযোগ করেনি। তাদের মতে, পুরো ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আবার প্রায় অর্ধেক পরিবারের দুর্নীতির অভিযোগ কোথায় ও কীভাবে করতে হয়, সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। যেমন দুদক সম্পর্কে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সরকারি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে মাত্র ১ দশমিক ৪ শতাংশ পরিবার জানলেও, অভিযোগ করার হার খুব কম। আবার অভিযোগ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করা হয় না বা ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দুর্নীতি হয় কেন, দুর্নীতি কমে না কেন এবং দুর্নীতি বাড়ে কেন-এসব প্রশ্নের সাধারণ উত্তর হিসেবে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, দুর্নীতির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ বিচারহীনতা, সচেতনতার অভাব এবং দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির বদলে সুবিধা পাওয়া। দুর্নীতিবাজরা দাপটের সঙ্গে থাকে এবং প্রমোশন পায়; খুব বেশি বিপদ দেখলে বিদেশে পাড়ি জমায়।

জরিপে দেখানো হয়েছে, গ্রামাঞ্চলের

পরিবারগুলো শহরের তুলনায় বেশি ঘুষের শিকার হয় (৬৬ শতাংশ বনাম ৫৮ দশমিক ৫ শতাংশ)। যদিও ঘুষের পরিমাণের দিক থেকে শহরের পরিবারগুলোকে বেশি টাকা দিতে হয়েছে। আর আয়ের দিক থেকে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো তাদের আয়ের তুলনায় বেশি ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। আরেকটি বিষয় উদ্বেগজনক-দুর্নীতি নারী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা প্রতিনিয়ত বলা হলেও প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবা চালু হলেও সেটি দুর্নীতি কমাতে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সেবাহীনতাদের এখনো দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, ফলে ঘুষ ও দুর্নীতির সুযোগ রয়েই যাচ্ছে।

টিআইবির প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিবাদ হবে, এটাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলবেন কেউ কেউ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান তো অভ্যুত্থানের পক্ষে মতামত দিয়েছিল। বিগত সরকারের দুর্নীতির কথাও তাদের প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছিল। ফলে বিষোদ্যাকার করার আগে প্রতিবেদন খতিয়ে দেখাই জরুরি। দেখা দরকার, কেন দুর্নীতি বন্ধ হয় না। দুর্নীতির শিকড় অক্ষুণ্ণ রেখে শুধু ডালপালা ছেঁটে দিলে দুর্নীতি বন্ধ হয় না; বরং নতুন ডালপালা, পাতা গজায়। পুরনো গাছ সবুজ হয়ে ওঠে নতুন পাতায়।

দুর্নীতি নয়, টাকা পাচার কি বন্ধ হয়েছে? না হয়নি। আর একটা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত ৪১ শতাংশ বেড়েছে। বিদেশে বিনিয়োগের জন্য ঘুরছেন, আস্থান জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী; আইএমএফের কাছে কঠিন শর্তে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে দাম বাড়ছে বিদ্যুতের, খরচ বাড়ছে উৎপাদনের, আর ঝুঁকি বাড়ছে রপ্তানির। অর্থ পাচার বন্ধ না হলে কি ঋণের টাকায় দেশের উন্নতি হবে? উন্নয়ন হবে কিছু অবকাঠামোর, সম্পদ বাড়বে মুষ্টিমেয় মানুষের। রাস্তা হবে, ব্রিজ-কালভার্ট হবে, ফ্লাইওভার বা মেট্রো রেল তৈরি হবে, গণমাধ্যমে প্রচার হবে। তবে দুর্নীতি খেয়ে ফেলবে উন্নয়নের দুধ-মধু। বৈষম্য বাড়বে বাধাহীনভাবে। কথাটা গুনতে হয়তো খারাপ লাগলেও বলতে হয়, পুঁজিবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন হচ্ছে দুর্নীতির উর্বর জমি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে যেন সার্বিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালনা করা হয়, সেটাই কাম্য। না হলে অভ্যুত্থান হবে কিন্তু কমবে না দুর্নীতি, বহাল থাকবে দুর্নীতিবাজরা।

কমরেড মুজিবুর রহমান ফরিদ এর মৃত্যু আছে, তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু নেই

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য ও সাবেক সমন্বয়ক কমরেড মুজিবুর রহমান ফরিদ এর অকাল প্রয়াণে ৪ জুলাই চুনাকুপাটের গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নাগরিক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদুজ্জামান খান কুতুব ও ১ নং গাজীপুর ইউপির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে এবং জেলার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলামের পরিচালনায়। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, জেলার আহ্বায়ক কমরেড নুরুজ্জামান তরফদার, চুনাকুপাট উপজেলার আহ্বায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার, শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের



সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুল হাসান চৌধুরী শাহিন, সিপিবি জেলার সদস্য আব্দুর রশিদ ১ নং গাজীপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির খান, সাম্যবাদী দল গাজীপুর শাখার নেতা জুয়েল মিয়া, আয়োজন কমিটির সদস্যসচিব আশ্রাব উল্লাহ, সিপিবি নেতা আব্দুল সামাদ,

গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এমরানুল হক, প্রয়াত কমরেড মুজিবুর রহমান ফরিদ এর ছেলে মুশফিকুর রহমান প্রান্ত।

শোকসভার শুরুতেই প্রয়াত কমরেড ফরিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লাল সালাম প্রদর্শন করা হয়।

শোকসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, কমরেড মুজিবুর রহমান ফরিদ এর মৃত্যু আছে কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু নেই। স্কুল জীবনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাসদ রাজনীতি সাথে যুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দলের আদর্শ ও সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বাসদ হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য এবং চুনাকুপাট উপজেলা শাখার সদস্যসচিব এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি কৃষক-শ্রমিক জনতার ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ের আন্দোলন করেছেন। চুনাকুপাটের স্থানীয় সমস্যা সংকটে নিরসনে সোচ্চার ছিলেন। তিনি যে কোনো অন্যায়, অত্যাচার-জুলুম, নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিতীক, সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

সেজান জুস কারখানা অগ্নিকাণ্ডের ৫ বছর পূর্তি, দায়ীদের শাস্তি দাবি

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

রূপগঞ্জে সেজান জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ৫ বছর পূর্তিতে ৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারী নিহতের জন্য মালিকসহ দায়ীদের শাস্তি, নিহত-আহত শ্রমিকদের পরিবারকে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে আজীবন আয়ের মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে ১০ জুলাই সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের জেলার সভাপতি আবু নাসিম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদির, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ, সহসভাপতি হাসনাত কবীর, সহসাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সোহেল।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২১ সালের ৮ জুন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে হাসেম ফুডস লিমিটেডের সেজান জুস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৫৪ জন শ্রমিক নিহত এবং কয়েকশত



শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও শ্রমিকদের এই নির্মম মৃত্যুর জন্য দায়ীদের শাস্তি হয়নি, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারসমূহকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি। ইতিমধ্যে মামলার চার্জশিট থেকে মালিক ও তার চার ছেলের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে সরকার ২ লক্ষ টাকা করে

দিয়েছে। এটা কর্মস্থলে মালিকের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতায় নিহত শ্রমিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। তাজরীন, রানা প্লাজা, সেজান জুস—এসব ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলা যাবে না; এটা হত্যাকাণ্ডের শামিল। সেজান জুস অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনঃতদন্ত করে মালিকদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও আইনের আওতায় এনে শাস্তি

দিতে হবে। নিহতদের আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে আজীবন আয়ের সমান মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে; আহতদেরও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকার শুধু তৈরি পোশাক শিল্পে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) চালু করেছে। শুধু পোশাক শিল্প নয়, সব ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) চালু করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭-এ বাংলাদেশকে অনুমোদন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সেজান জুসের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা এবং ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রাণহানি রোধ করতে করণীয় নির্ধারণে স্কেপের পক্ষ থেকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৭ দফা পর্যবেক্ষণ ও ১২ দফা সুপারিশসহ স্কেপের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস কমিটির প্রতিবেদন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ দান-অনুদান নয়, নিহতদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ, সেজান জুস কারখানা কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার নিশ্চিত ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৭১তম বর্ষ পালিত

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

নওগাঁ জেলা

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২৬ আশ্বাদ্বিগুন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু-কানু স্মরণে ১৭১তম সাঁওতাল দিবসের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি মঙ্গল কিসকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নওগাঁ জেলা আহবায়ক কমরেড জয়নাল আবেদীন মুকুল, কৃষকনেতা রবিউল টুডু, শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি কালিপদ সরকার, মহিলা ফোরামের সংগঠক মেরি মার্ভি, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জেলা সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার, ছাত্র ফ্রন্ট নওগাঁ জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান মিজান ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ধামইরহাট উপজেলা সভাপতি বিজয় একা ও সমর উরাও। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ ধামইরহাট উপজেলা আহবায়ক দেবলাল টুডু।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভাগনাডিহি গ্রামে দশ হাজার সাঁওতাল এক বিরাট সমাবেশে মিলিত হন। সিধু ও কানু মুরমু নামে দুই ভাই এই সমাবেশে ডাক দেন; ব্রিটিশ শাসন, জমিদারের অত্যাচার ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলতে। এটি ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সাঁওতাল হুল-এর সূচনা।

১৮৩২ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজমহল পাহাড়ের উপত্যকায় দামিন-ই-কোহ নামক অঞ্চলটিতে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের আশ্রয় জানায়। কোম্পানি সাঁওতালদের প্রতিশ্রুতি দেয়—জমি, অর্থনৈতিক সুবিধা, সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের। তাদের কথায় আকৃষ্ট হয়ে কটক-ধলভূম, মানভূম-হাজারিবাগ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক



সাঁওতাল এখানে এসে বসবাস শুরু করে।

সাঁওতালরা এখানে এসে দেখে—তাদের জন্য দেওয়া ভূমি বনজঙ্গল, টিলা, উঁচু-নিচু অনুর্বর পাহাড়ি এলাকা, যা চাষের অনুপযোগী। তখন সাঁওতালদের কঠোর পরিশ্রমেই এই পতিত ভূমি ধীরে ধীরে চাষেরযোগ্য কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের বলা হয়েছিল, প্রাকৃতিক ভূমিতে শ্রম দিয়ে যে জমি চাষের উপযুক্ত করবে, সেই জমির মালিক তারা হইবে।

সাঁওতালরা যখন জঙ্গল পরিষ্কার করে উর্বর জমিতে পরিণত করল, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও জমিদাররা সেই জমির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কয়েম করতে শুরু করে। ফলে এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আয় প্রায় ৬০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি সুদখোর মহাজনরা ঋণ প্রদান করে নানা কৌশলে সাঁওতালদের শোষণ করতে থাকে। এদের সুদের হার এত বেশি ছিল, যা ২৫% থেকে ৫০০% পর্যন্ত। মহাজনরা সাঁওতালদের কাছ থেকে যখন ফসল কিনত, তখন ওজনে কারচুপি ও ফসল চুরি করে এদের

ঠাকাত। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সাঁওতাল ও তাদের পরিবারকে দাসে পরিণত করা হতো। খাজনা ও সুদ হিসেবে জমি, গবাদিপশু ও ফসল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হতো।

এই অন্যায় সাঁওতালদের আইনি প্রতিকার পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ব্রিটিশ আদালত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল, আর মহাজন ও জমিদাররা প্রায়ই পুলিশ প্রশাসন ও আদালতের কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করত।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার লিখেছেন—সাঁওতালরা অজ্ঞ ও সং ছিল; জমিদার ছিল ধূর্ত ও নির্দয়। একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তার মতে, মহাজনেরা বর্ষাকালে সাঁওতালদের অল্প কিছু টাকা বা চাল ধার দিত এবং ফসল তোলার সময় একটি পাথর তুলে সেটিতে সিঁদুর লাগিয়ে ওজনের সঠিকতা দেখিয়ে সাঁওতালদের প্রায় সমগ্র ফসল কেড়ে নিত, তবুও তাদের ঋণ থাকত অপরিশোধিত।

১৮৫৫ সালের মধ্যেই সাঁওতালদের মধ্যে অসন্তোষ চরমে ওঠে। সিধু ও কানু মুরমু

ভাগনাডিহিতে প্রায় ১০ হাজার সাঁওতালকে সমবেত করেন। তারা দাবি তোলেন—জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাঁওতালদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিধু-কানু তাদের অপর দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরব-সহ কলকাতায় গভর্নর-জেনারেলের কাছে তাদের দাবি পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সেনা ও জমিদারের বাহিনী তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে।

প্রতিবাদে সাঁওতালরাও বিদ্রোহ শুরু করে এবং তা দ্রুত আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। আনুমানিক ৬০ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশ নেয়। ফুলোমনি ও ঝালোমনি মুরমু-সিধু-কানুর বোনেরা-নারীদের সংগঠিত করেন। আদালতের নথি থেকে জানা যায়, প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল নারীই বিদ্রোহী ছিলেন এবং তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপক সামরিক শক্তি মোতায়েন করে। বেঙ্গল আর্মির ১০ শতাংশ পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ দমনে অংশ নেয়। সাঁওতালদের আদিম অস্ত্র তীর-ধনুক, তলোয়ার ও কুঠার-ব্রিটিশদের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে অকার্যকর ছিল। ১৪-১৫ জুলাই মহেশপুরে ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় ১০০ বিদ্রোহীকে হত্যা করে; সিধু ও কানু আহত অবস্থায় পালিয়ে যান।

১৮৫৫ সালের ১০ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলে মার্শাল ল জারি করে। কানু নভেম্বর শেষে গ্রেপ্তার হন এবং ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সিধু নিহত হয়। আনুমানিক ১৫,০০০-২০,০০০ সাঁওতাল ওই বিদ্রোহে প্রাণ হারান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করলেও আন্দোলনের উত্তাপ এবং নির্মম অত্যাচারের যন্ত্রণা তারা বয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ঐতিহ্যবাদী ভূমির অধিকার রক্ষায় স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন, ভূমি উচ্ছেদ ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ও হয়রানি বন্ধ করা, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং পাঠ্যপুস্তকে তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষাকে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরার দাবি জানানো হয়।

ফেনীতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের আগমনের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

সারা বিশ্ব তোকে ধ্বংস করতে উদ্যত। ...আচার তার জগদলপাথর তোর বুকে বসিয়ে দিয়েছে, সমাজ তোর কণ্ঠরোধ করে ফেলেছে। ধনীর অট্টহাস্য তোর প্রাণের করুণ কাঁদুনি ঢেকেছে। ...যার ঘরে বসে কথা বলার অধিকার নেই, দুপুর-রাত্তে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙানোর যার শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কী? যাকে নিজের ঘরে পরেই এসে অবহেলায় পশুর মতো মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন, বাবা-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করার আশা নেই, তার আবার ধর্ম কী? দুবেলা দুটি খাবারের জন্যই যার বাঁচা, একটুখানি আরাম করে কাল কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কী? মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কী?’

ধর্মীয় প্রচারণার রাজনীতি ও শাসন-শোষণের পক্ষের শক্তির উদ্দেশ্যে বলেন—

‘...ধর্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত/ বলে এরা হয়ে মন্ত্রী, করবে স্বধর্মীদের হিত।’

ধর্মের নামে কড়াকড়ির ফলাফল দেখে তিনি দুঃখ করে বলেন, ‘আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী নেই, ভাস্কর নেই, সংগীতজ্ঞ নেই, বৈজ্ঞানিক নেই—ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কী আছে? যারা জন্মগত প্রেরণা নিয়ে এসেছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাদের টুটি চেপে মেরে ফেলেছে ও ফেলছে।’

সাম্প্রদায়িকতা যে শাসকদের বড় অস্ত্র, তা চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। ১৯৩১ সালে *কুহেলিকা* উপন্যাসের একটি চরিত্র প্রমত্তের মুখ দিয়ে তিনি বলেন, ‘ইংরেজদের ভারত শাসনের বড় অস্ত্রটি কী জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মকে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। এই ভেদনীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রেখেছে। ...যেদিন ভারত একজাতি হবে, সেদিন ইংরেজকেও বোঁচকা পুটলি বাঁধতে হবে।’

আর এক চরিত্র অনিমেষ বলেন, ‘আমরা বিপ্রববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও আমরা পেরোতে পারিনি—ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।’

প্রমত্ত আরও বলেন, ‘হিন্দু-মুসলমান—এ দুটো নামের মন্ত্রোষধই ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষাকবচ।’

মানুষকে অস্পৃশ্য ভাবার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক বোধে উন্নীত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যুক্তিতে এবং আবেগে—‘হিন্দু, হিন্দু থাক্, মুসলমান, মুসলমান থাক্, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়িয়ে মানব, তোমার কর্ণে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি—আমার মানুষ ধর্ম। দেখবে দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কেঁপে উঠছে। ...মানবতার এই মহাযুগে একবার গণ্ডি কেটে বেরিয়ে এসে বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্্র নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য।’

নজরুল বাংলার সংগীতের এক বিশাল ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন—গজল, কাওয়ালি, নাত-গীত, ভজন-কাব্যগীতি, দেশাত্ববোধক

গান, কোরাস-কুচকাওয়াজের গান, ধর্মীয় সংগীত, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, রাগপ্রধান গান, শিশুসঙ্গীতসহ তিন হাজারের বেশি গান রচনা করেন। কবিতা যে কত বড় সামাজিক দায় পালন করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন নজরুল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ‘যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে’ প্রবন্ধে ক্ষেত্র গুপ্ত লেখেন—‘শরৎচন্দ্র বাংলা কাহিনিকে এবং নজরুল বাংলা কবিতাকে অল্প ও মধ্যশিক্ষিত অগণিত বাঙালি পাঠকের কাছে নিয়ে আসেন।... নজরুল আরও একটা বড় কাজ করেছিলেন, খুব বড়—বাঙালি মুসলমানকে বাংলা সাহিত্যের আপনজনে পরিণত করলেন। বাংলা সাহিত্যের হিন্দু প্রাধান্য যদি বিংশ শতকের নবশিক্ষিত মুসলমান তরুণদের স্বতন্ত্র ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সন্ধানে উৎসাহী করে তোলে, তাকে স্বাভাবিক বলেই মানতে হবে। কিন্তু তার ফলে বাংলা সাহিত্যের যে বিভাজন দেখা দিতে পারত—কিছুটা তো দেখা দিয়েছিল—তাকে রাশ টেনে রুখে দিলেন নজরুলই। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যের মূলস্রোতের অভিমুখিতা ঘটল তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে। একই সঙ্গে বাঙালি হিন্দু পুরাণের প্রসঙ্গ এবং ইসলামী কাহিনি ও বিশ্বাসের জগতকে পেল নজরুল, গ্রহণে দ্বিধা করল না। ঠিক তেমনি মুসলমান পাঠকও এই যুক্তবেণী কাব্যস্রোতে সহজে অবগাহন করতে পারল। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এই ঘটনার গুরুত্ব খুবই বেশি।’ এ প্রসঙ্গে অনুদাশঙ্কর রায়ের কবিতাটি স্মরণযোগ্য—

‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নি কো নজরুল/ এই ভুলটুকু বেঁচে থাক/ বাঙালি বলতে একজন আছে/ দুর্গতি তার ঘুচে যাক।’

নজরুল নিজের ভাষায় বলেছেন, ‘আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দুদের দেবীর নাম নেই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।’ সব উদ্যোগ এবং আয়োজন যেন তাৎক্ষণিক না হয়, সেই বিবেচনায় তিনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে বলেন, ‘আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের-সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন। ...আমি এই রূপ কালচারাল সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক। পলিটিকেল নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনারদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব এবং সেটুকু কারও কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজও যে স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু হয়নি—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। ...যদি পারেন, মাতৃভাষায় আপনারদের

সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন।’

সমাজে যত রকমের বিভক্তি ও বিদ্বেষ চর্চা হয়, সেসবের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল সক্রিয়। নারীর লাঞ্ছনায় সহানুভূতির চেয়েও সংগ্রামের পথে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। নারীর অবদানের স্বীকৃতি ও সংগ্রামের আহ্বান ছিল লেখার মূল ভরকেন্দ্র। লিখেছেন—

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর/ ...মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল/ ...দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।’

নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর আহ্বান ছিল অগ্নিবরা—

‘কারার ঐ লৌহ-কপাট/ ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট/ ...লাথি মার ভাঙ রে তাল্য/ যত সব বন্দীশালা/ আগুন জ্বালা/ আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।’

‘এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল ...। এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!’

কৃষকের বঞ্চনা ও মহাজনের শোষণের রূপ তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর লেখায়। ‘চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনৎ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত-মাড় খাইতে পায় না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা টেনা বা নেঙটি ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পরন সারা জীবনেও ঘটিয়া ওঠে না, ছেলেমেয়েদের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বার মাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন।’

তরুণ ও যুবকেরা ছিল তাঁর ভরসা। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি নিয়ে ভেবেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘আমরা চাই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহমন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। ...’

পৃথিবীতে অন্যায় থাকবে আর তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াবে না—এটা ইতিহাসের শিক্ষা নয়। ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞা, ‘আমি সেই দিন হবো শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না। আমি সেই দিন হবো শান্ত।’

সংগ্রামের পথে বাইরের বাধার চাইতেও দোদুল্যমান মানসিকতা অনেক বেশি ক্ষতিকারক। ফলে এর বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল অবিরাম। কংগ্রেসের নেতাদের আপসমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল শাণিত। তিনি তীব্র কশাঘাত করেছিলেন এই দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে।

‘বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই-স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ-তাই।’

‘ভারত হবে ভারতবাসীর’—এই কথাটাও

বলতে ভয়, সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।’

তারুণ্যকে তিনি চিহ্নিত করেছেন সাহস, শক্তি আর উদ্দীপনার বাহন হিসেবে। ফলে প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা ছিল সেই তরুণের প্রতি যারা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সেই তরুণের জন্য—তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার—যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতি-বেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তও-প্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লাস্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুঈনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল সানইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে। সংগ্রামের পথ যে কত বিপদ ও বেদনার, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘...শত্রুর সেনা যখন তোমার ঘরে রক্তশ্রোত বহাইয়া দিবে, তখন তোমার চক্ষু পশ্চাতে ফিরিবে না তো? ...তোমরা এ অন্ধকারে চলিতে পারিবে তো? ...মাতার ক্রন্দন, প্রিয়ার ব্যাকুলতা দলিত করিয়া একা এই অন্ধকারে পথ চলিতে পারিবে তো?’

সাম্প্রদায়িক বিষবাস্পে যেন তরুণরা আচ্ছন্ন না হয়, পথ হারায়, সেকারণে অতীতের উদাহরণ দিয়ে তাদের মনটাকে বড় করার চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল বসু মোগল যুগের যে প্রখ্যাত শিল্পীদের নাম করেছেন, তার মধ্যে ১০৮ জন হিন্দু, ৯১ জন মুসলমান। ঐ সময়ের বহু শিল্পকর্ম হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদের মিলিত ফসল। মুসলমান কবিরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। ভারতীয় সনাতন সঙ্গীত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ... মধ্য যুগের প্রধানতম স্থাপত্য তাজমহল উভয় সম্প্রদায়ের স্থাপত্যশৈলীর মিলনের নিদর্শন। মন্দিরের স্থাপত্যরীতি ছায়া ফেলেছে মসজিদের গায়ে, মসজিদের গঠনে পাওয়া যায় মন্দিরের ছাপ।

তিনি বলেছেন, ‘আদম, দাউদ, ঈসা-মূসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ / কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, কবীর-বিশ্বের সম্পদ / আমাদেরই এরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে / তাদেরই রক্ত কমবেশি করে প্রতি ধমনীতে বাজে।’

যৌবনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি নিজেও চিন্তা, কর্ম ও সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কোথা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তা বলতে গিয়ে বলেছেন, ‘হিন্দু-মুসলমানের দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষণশুল্কপের মতো জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।’

আজ সমাজে যখন এত বৈষম্য ও ভেদাভেদ, তারুণ্যের শক্তির অপচয়, তখন নজরুলের সেই আকৃতি যেন কিশোর-তরুণ, যুবসমাজের আহ্বানের মতো সংগ্রামের পথে অবিচল রাখে—এই প্রত্যাশা আমরা করি।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের কথা : ভিল্‌হেল্ম লিব্‌নেখ্ট

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে যিনি তাঁকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রাণদানে সহায়তা করেছেন, *অ্যান্টি-ডুরিং* বা চিন্তাশক্তির অধিকারী যে-কোনো মানুষের বোধগম্য স্ফটিক-স্বচ্ছ বিজ্ঞানের সেই বিশ্বকোষের রচয়িতা যিনি, *পরিবারের উৎপত্তি* ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সংবাদপত্রের নিবন্ধের

যিনি প্রণেতা, সেই বন্ধু, উপদেষ্টা, নেতা ও যোদ্ধা মানুষটি আর নেই—তিনি প্রয়াত।

কিন্তু যেখানেই শ্রেণি-সচেতন প্রলেতারিয়ানরা বেঁচে আছেন আর লড়াই করছেন সেইখানেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে তাঁর মর্মবাণী।

সম্পাদকীয় টীকা :

১. সংশ্লিষ্ট রচনাটি ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত

হয়। -সম্পা.

২. ১৮৯৫ সালে তৎকালীন স্প্যানিশ উপনিবেশ কিউবা দ্বীপে যে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তা দমন করার ব্যাপারে স্প্যানিশ গভর্নমেন্টের ব্যর্থতার কথাই এখানে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করছেন লেখক। -সম্পা.

৩. লাজার নিকোলা কার্নো (১৭৫৩-১৮২৩) - ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লব সংগঠনের কালে ফরাসি

রাজনীতিবিদ ও সেনানায়ক, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী। -সম্পা.

৪. ১৮৯৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বার্লিনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস এই কথাগুলি বলেন। -সম্পা.

৫. এই তিন ব্যক্তি হলেন যথাক্রমে ভিলহেলম লিবনেখ্ট, ফার্দিনান্দ অগাস্ট বেবেল এবং প. জিঙ্গার। -সম্পাদক।

নীতিমালা চূড়ান্ত ও আধুনিকায়ন করে রিকশা-ইজিবাইকের নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স দ্রুত প্রদানের দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

টোকেন বা কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার পথ প্রশস্ত করেছে। একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে আমরা এই সেক্টরের ৬০ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় বিএনপি সরকারের অগ্রাধিকার পরিকল্পনায় ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নীতিমালা চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে গত ১৯ এপ্রিল সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছি।

আপনারা জানেন, রিকশা চালানো প্রচণ্ড অমানবিক পরিশ্রমের কাজ। প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল বৃষ্টি কিংবা তীব্র শীতেও নিজের জীবিকা ও যাত্রীর সুবিধার কথা ভেবে দিনে ও রাতে রিকশাচালকরা সড়কে রিকশা চালিয়ে থাকে। চালকদের পরিশ্রম লাঘব, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য আর খরচ কমানোর কথা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে রিকশায় ব্যাটারি স্থাপন করা শুরু হয়। প্রথমদিকে নির্মাণজনিত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও ইতিমধ্যে তার অনেকাংশই দূর করে আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এই বাহন যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। এই সব বাহন ব্যবহার সহজ, সস্তা এবং শহরের ছোট রাস্তায় চলতে পারে বলে স্বল্প আয়ের মানুষের দৈনন্দিন কাজে এক অপরিহার্য বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশে প্রায় ৫০ লাখ চালক ও ১০ লাখ মালিক, গ্যারেজমালিক, চার্জিং ব্যবসায়ী, মেকানিকসহ ৬০ লাখ পরিবার এই সব ব্যাটারিচালিত প্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। এর সঙ্গে যানবাহন তৈরি, মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ নির্মাণ, বিক্রি, ব্যাটারি উৎপাদন ও বিপণনসহ নানা ধরনের কাজে অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বিপুল মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় একটি সমন্বিত নীতিমালার দাবি দেশবাসীর দীর্ঘদিনের।

কর্মসংস্থানের বিচারে এটি দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রমখাত, যারা সরকারের কোনো ধরনের সহায়তা ছাড়াই কাজ করছে। তাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষ। এই মানুষের আয়, ব্যবসা ও উৎপাদন ঘিরে এ সেক্টর প্রতি বছর দেশের জিডিপিতে প্রায় ৩

লাখ কোটি টাকা অবদান রাখছে। কিন্তু তাদের অবদানের আইনগত স্বীকৃতি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যে কোনো মোটরযান বা যান্ত্রিকযানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স দেওয়ার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বিআরটিএ। কিন্তু কোনো সক্ষমতা বা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সিটি কর্পোরেশনকে এই দায়িত্ব দেওয়ার আয়োজন করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার আইনে ব্যাটারিচালিত যানবাহন বা এই ধরনের গাড়ির নিবন্ধন ও লাইসেন্স দেওয়ার অনুমতি নেই। আপনারা আরও অবগত আছেন, বিআরটিএ ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে একটি নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ইতিপূর্বে ২০১৯, ২০২২, ২০২৪ সালে ২টি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। এর মধ্যে একটি নীতিমালা কার্যকর হয়েছে, আর একটি অপেক্ষায় আছে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি করে সেগুলি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছিলাম। সর্বশেষ ২০২৫ সালে আবার নতুন করে 'বৈদ্যুতিক প্রি হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫' প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমরা জানতে পেরে এই নীতিমালার ওপর সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে গত ২০ আগস্ট ২০২৫ অনেকগুলি সংশোধনী, সংযোজনী ও সুপারিশ বিআরটিএ চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপির মাধ্যমে পেশ করেছি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২০২৫ সালের ৪৫ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ এর ৬০ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে কোনো রকম কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো সমন্বয় ছাড়া, দুটি খসড়া নীতিমালা থাকার পরেও এবং কোনো অংশীজনদের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন, নীতিমালা নির্ধারণসহ এ বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা সিটি কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। কেন এবং কার স্বার্থে এসব করা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান হওয়া উচিত বলে আমরা মনে

করি। আমরা চাই না কোনো বিশেষ ব্যবসায়িক সিডিকেট গোষ্ঠীর কাছে ৬০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থার এই খাত যেন জিম্মি হয়ে না পড়ে।

তীব্র বেকারত্বের এই দেশে কর্মসংস্থানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং যানজট নিরসন ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স-প্রশিক্ষণ, রুট পারমিট, স্বল্পগতির ও স্থানীয় যানবাহনের জন্য পৃথক লেন বা সার্ভিস রোড নির্মাণ করার কোনো বিকল্প নেই। সংগ্রাম পরিষদ বিগত ১৩ বছর ধরে ধারাবাহিক যানজট নিরসন ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। আমাদের প্রত্যাশা, আজকের গোলটেবিল বৈঠকে সকল অংশীজনের আলোচনা, মতামত ও সুপারিশ থেকে এর একটি স্থায়ী সমাধান প্রস্তাব তৈরি করা সম্ভব হবে। এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা সারাদেশে মতবিনিময় সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নেব। আমরা মনে করি, আধুনিকায়ন করে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের একটি অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত করাসহ ১০ দফা বাস্তবায়ন করে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো আজ সময়ের দাবি।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, এই সংগঠনটি ১৩ বছর ধরে উল্লেখিত দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের কাজ পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তারা এই অধিকার রক্ষায় কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে? একটি দেশকে তখনই গণতান্ত্রিক বলা যায়, যখন মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত থাকে। প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষ শ্রমের বাজারে আসে, যার মধ্যে মাত্র ৮ থেকে ৯ লাখের কর্মসংস্থান হয়; বাকিদের জীবিকা সংস্থানের উপায় থাকে না। এ সময়ে দেশে কারখানাও বন্ধ হচ্ছে, ফলে বেকারত্ব গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের একাংশ মানুষ যানজটের জন্য রিকশাকে দায়ী করেন, কিন্তু এর মূল কারণ তারা কি খতিয়ে দেখছেন? যদি দেখতেন তা হলে তারা এর জন্য রিকশাকে দায়ী করতে না।

মানুষ বাঁচার তাগিদে শহরমুখী হয়ে

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য রিকশা বা হকারি বেছে নিচ্ছে। তারা নিয়ম মেনেই রিকশা চালাতে চায়, কিন্তু সরকার সে সুযোগ দিচ্ছে না। এতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষের শ্রম লাঘব ও জীবন সহজ করার জন্য; তাই রিকশায় ব্যাটারি লাগানো অন্যায্য নয়। ব্যাটারি রিকশার যন্ত্রাংশ বা ব্যাটারি আমদানি ও তৈরি নিষিদ্ধ নয়, অথচ ব্যাটারি রিকশা নিষিদ্ধ করা হাস্যকর। দুর্ঘটনায় মোটরবাইক বা বাস-ট্রাক এগিয়ে থাকলেও সেগুলো তো বন্ধের কথা উঠছে না! ট্রাফিক আইন ভাঙার সংস্কৃতি দেশে সব চালকদের মধ্যেই আছে। রিকশা অবৈধ রাখলে সরকারদলীয় লোক, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের সিডিকেট চাঁদা আদায় করতে পারে। চালকরা সরকারি কোষাগারে ট্যাক্স দিয়ে বৈধভাবে লাইসেন্স নিতে চায়। গণ অভ্যুত্থানে ৪৬ জন রিকশাচালক প্রাণ দিয়েছেন। ব্যাটারি রিকশা নেপাল, ভারত ও শ্রীলঙ্কাতেও রয়েছে। বিএনপি সরকারের ১৮০ দিনের পরিকল্পনার মধ্যে এই খাতকে যুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি। সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা ও জনবল না থাকা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব তাদের দেওয়া ঠিক নয়; সারা দেশের জন্য বিআরটিএ-র অধীনেই অভিন্ন নিয়ম থাকা উচিত, নইলে দুর্নীতির আখড়া তৈরি হবে।

মুসা মিয়া বলেন, এখানে নীতিগত শূন্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে। তিনটি খসড়া নীতিমালা তৈরি হলেও রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের অভাবে তা আলোর মুখ দেখেনি। নেপালের অভিজ্ঞতার আলোকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সড়ক অবকাঠামো, লাইসেন্স, ব্যাটারি ও গাড়ির লাইফ সাইকেল, চার্জিং স্টেশন ও সড়ক নিরাপত্তার সমন্বয় ঘটাতে হবে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মতো স্থানীয়ভাবে লাইসেন্স বন্টন দুর্নীতির সুযোগ বাড়ায়। তাই চালক, মালিক ও প্রশাসনের মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও অভিন্ন নীতিমালা প্রয়োজন।

মমতাজুল জািন্নাত বলেন, সরকার তাৎক্ষণিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত নেয় বলে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হয় না। যাত্রীদের মধ্যে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের চাহিদা রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে ধাপে ধাপে রেগুলেশন বা নিয়মকানুন বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

পাওনা পরিশোধ ছাড়া বন্ধ অলিম্পিক সিমেন্ট এন্ড ফাইবার লিমিটেড কারখানা

বিপাকে চার শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী

বরিশালের রূপাতলিতে অবস্থিত ‘অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড’ কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রম আইন অমান্য করে আকস্মিকভাবে কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। গত ১১ জুন ২০২৬ অলিম্পিক ফাইবার এবং ১৩ জুন অলিম্পিক সিমেন্ট কারখানা দুটিতে স্থায়ীভাবে বন্ধের নোটিশ বুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ।

হঠাৎ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তা ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন চার শতাধিক শ্রমিক ও তাদের পরিবার। কারখানায় সক্রিয় সিবিএ (CBA) নেতৃবৃন্দের সাথে কোনো প্রকার আলোচনা বা অবহিত না করেই একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমনকি কারখানা বন্ধের ঘোষণাপত্রে শ্রমিকদের আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ কিংবা সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাও উল্লেখ করা হয়নি।

মালিকপক্ষের এমন অগণতান্ত্রিক ও বেআইনি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং আইনানুগ



পাওনা পরিশোধের দাবিতে গত ১১ জুন থেকেই আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকরা। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ আগস্ট টানা ৬২ দিনের মতো কারখানার প্রাঙ্গণে দিনরাত শান্তিপূর্ণ লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা।

শ্রমিকরা গত ৬২ দিন ধরে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে ধারাবাহিকভাবে নানা কর্মসূচি

পালন করছে। বকেয়া আদায়ের দাবিতে তারা নিজেদের সন্তানদের নিয়ে আবেগঘন সমাবেশ, ভুখা মিছিল, তিন দফা রূপাতলি মহাসড়ক অবরোধ এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।

আন্দোলন চলাকালে এ পর্যন্ত তিন দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো কার্যকর

সমাধান আসেনি। মালিকপক্ষ কেবল বকেয়া বেতনের আংশিক পরিশোধ করেছে। কিন্তু শ্রমিকদের ওভারটাইম, নাইট ভাতা, চার মাসের নোটিশ পে, সার্ভিস বেনিফিট এবং অর্জিত ছুটির পাওনাসহ মূল আইনানুগ হিসাব পরিশোধের বিষয়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হচ্ছে না।

শ্রম আইন অনুযায়ী চাকরির মেয়াদকাল বিবেচনা করে সমুদয় পাওনা বুঝে পেতে শ্রমিকরা দিনরাত কারখানাতেই অবস্থান করছেন। তাদের এই বাঁচার লড়াইয়ে সংহতি জানিয়েছে স্থানীয় অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলো। বর্তমানে বরিশালের ৮টি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট একাত্ম হয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমিক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কোনো চক্রান্ত বা বিলম্ব করে শ্রমিকদের রক্তধাম করা উপার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করতে দেওয়া হবে না। শ্রম আইন অনুযায়ী অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের প্রতিটি শ্রমিকের চার মাসের নোটিশ পে, সার্ভিস বেনিফিট ও বকেয়া ভাতাসহ সমুদয় হিসাব অবিলম্বে বুঝিয়ে না দেওয়া হলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বাসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মীয়
ফ্যাসিবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িক
অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ
আন্দোলন গড়ে তুলুন

শ্রদ্ধাঞ্জলি পরবর্তী সমাবেশে :
কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

২৬ জুন ২০২৬ শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে সকাল আটটায় মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য মাস্টিন উদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা নগর কমিটির নেতা নাসির উদ্দিন প্রিন্স, রুখশানা আফরোজ আশা, আনোয়ারুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন তাজু, ইলিয়াস হাসান ইলু প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে প্রদত্ত বক্তব্যে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের পূর্ণাঙ্গ বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড কার্যকর না হওয়া এবং শাসক দলগুলোর অপশাসন ও দুঃশাসনের সাথে মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রশ্লবদ্ধ করে এবং তার অর্জনকে ছোট করার চেষ্টা করছে-যা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকেই হেয় করার শামিল।

কমরেড ফিরোজ বলেন, স্বাধীনতার পরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকেরা তা করেনি; বরং তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ৭১-এর ঘাতক যুদ্ধাপরাধীরা গুলি টিকে থাকেনি, পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে মহীরুহ রূপ ধারণ করেছে। যার কারণে মরণব্যাধি ক্যাপারে আক্রান্ত হয়েছে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম জীবিত অবস্থায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার



ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক।

তিনি অভিযোগ করেন, বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে কতিপয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, বাহিনী গঠন করে এবং সরাসরি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগকারী সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং যুদ্ধাপরাধী গণহত্যাকারী দলের বিচার ও তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করেনি। বরং শাসক শ্রেণির দুই বৃহৎ দল প্রতিযোগিতা করে কে কত বেশি রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহার করবে এবং স্বাধীনতাবিরোধী দলকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকেছে। স্বাধীনতার ৫৫ বছরে ক্ষমতাসীন

বুর্জোয়া দলগুলো পালাক্রমে দেশ পরিচালনা করলেও তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে কাজ করেছে।

তিনি বলেন, ইতিহাস এই সত্য প্রমাণ করেছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির সংগ্রামকে দুর্বল ও অক্ষম করে দেয়। তাই শোষকরা ধর্মকে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে। মেহনতি মানুষকে যারা ধোঁকা দেয়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়, লোভ দেখায় তাদের সকল সরূপ উন্মোচন করতে হবে।

তিনি বলেন, গত ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশ্রয়ে ১৮ মাসে ধর্মদ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আক্ষালন সীমা ছাড়িয়েছে। কথিত তৌহিদী জনতার নামে নারীদের পোশাক নিয়ে মোরাল

পুলিশিং, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন বেড়েছিল। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, কথিত ধর্ম অবমাননার নামে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষকসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মব সন্ত্রাসের আতঙ্ক নির্বাচনের পরে এখনও চলমান রয়েছে। কয়েক দিন আগেই এই বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পাশেই অবস্থিত মিরপুর ১ নম্বরে শাহ আলী মাজারে মব সৃষ্টি করে হামলা তার প্রমাণ।

তিনি আরও বলেন, লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচিত সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের নামে শোক প্রস্তাব পাস করা, চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী, আলবদর কমান্ডার, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এটিএম আজহারকে অন্তর্বর্তী সরকার বেকসুর খালাস দিয়েছে-এ সবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের শহিদদের আত্মত্যাগের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। দেশের মানুষ আবারও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ শাসন করে শাসকশ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্ত-দুর্ভাগ্যিত আদর্শহীন বুর্জোয়া রাজনীতি দেশকে আজ চরম অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দুর্গতি ও দুর্দশার জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

সমাবেশে তিনি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, স্বাধীনতাবিরোধী গণহত্যাকারী দলসহ সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জানান। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় ও গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকেও শহিদ জননী জাহানারা ইমামের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন অব রেভ্যুলিউশনারি পার্টিস্
এন্ড অর্গানাইজেশনস্ এশিয়ার ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ পুনঃনির্বাচিত

৪ ও ৫ জুলাই '২৬ নেপালের কাঠমন্ডু ভ্যালির ললিতপুরে হোটেল গোদাওয়ারিতে দুই দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন অব রেভ্যুলিউশনারি পার্টিস্ এন্ড অর্গানাইজেশনস্ (ICOR) এর এশিয়া কন্টিনেন্টাল কনফারেন্স

অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। কনফারেন্সে ICOR এশিয়ার ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন।



বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের-এর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলা শাখা

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের, বীর উত্তম-এর ৫০তম ফাঁসি দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে ছাত্র ফ্রন্ট ময়মনসিংহ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে তাঁরই সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাব লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে আহত হয়ে এক পা

হারান।

মুক্তিযুদ্ধের পরে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মতবিরোধের কারণে ১৯৭২ সালে তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি সাম্যবাদী-শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বীর সেনানী ও জাসদের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবের অন্যতম পরিকল্পনাকারী ও পরিচালনাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখায় তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে এক প্রহসনের বিচারে ফাঁসির দণ্ডদেশ দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়।

কমরেড মাহাবুবুর রহমান মোহনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ খুলনা জেলা শাখার আয়োজনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খুলনা জেলা শাখার সাবেক সভাপতি কমরেড মাহাবুবুর রহমান মোহনের স্মরণসভা দলের খালিশপুর শিল্পাঞ্চল কার্যালয়ে জেলা আহ্বায়ক কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টুর সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব কোহিনুর আক্তার কনার সঞ্চালনায় ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ খুলনা জেলা সদস্য আব্দুল করিম, অ্যাড. সনজিত মণ্ডল, সিপিবি খুলনা জেলার সদস্য পলাশ দাশ, উদীচী দৌলতপুর থানা সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মিতন, কবি প্রভাত মজুমদার, সাংস্কৃতিক কর্মী সরজিৎ রায় পল্লব, শাহেদ শুভ, শ্রমিক ফ্রন্ট খুলনা জেলা সদস্য ইউনুস আহমেদ মাসুদ, কমরেড মোহনের কন্যা প্রকৃতি রহমান প্রমুখ।



শিক্ষাবিদ-গবেষক ও লেখক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হকের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৫ জুলাই '২৬ সংবাদপত্রে দেওয়া এক শোক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক,

বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন দেশের একজন স্বাধীন চেতনা গবেষক, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। বাংলা ভাষা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা, রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে সাহিত্য-গবেষণায় তাঁর অসামান্য অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর চিন্তা, গবেষণা ও লেখনী দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমরা এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক আবুল কাশেম ফজলুল হকের প্রয়াণে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি; একই সাথে তাঁর শোক সন্তুষ্ট পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি মালিকদের কাছে বিক্রির সরকারি চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও

শেষ পৃষ্ঠার পর

আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সাময়িক আর্থিক লাভ কিংবা বিনিয়োগ আকর্ষণের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এই সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ও রহিত করা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, সরকার ১৩টি চিনিকলসহ ৪৪টি শিল্পসম্পদ বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করার ঘোষণা করেছে। কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে এগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, সম্পদগুলোর প্রকৃত আর্থিক মূল্য কত, তা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কিনা, কী শর্তে ইজারা বা যৌথ বিনিয়োগ হবে, রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কতটুকু বজায় থাকবে—এসব বিষয়ে জনগণের সামনে কোনো স্বচ্ছ তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। জাতীয় সম্পদ নিয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের জনগণ, শিল্পের অংশীদার শ্রমিক, বিশেষজ্ঞ, এমনকি জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে

গ্রহণ করা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সভায় থেকে অবিলম্বে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব শিল্পকারখানা বেসরকারি পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ বন্ধ করার, প্রস্তাবিত ৪৪টি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, মূল্যায়ন ও প্রস্তাবিত চুক্তির শর্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করা, শ্রমিক সংগঠন, অর্থনীতিবিদ, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে জাতীয় আলোচনা আয়োজন এবং বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব চিনিকল পাটকলসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন করে পুনরায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালুর জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় শিল্পনীতি প্রণয়নের দাবি জানানো হয়।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, জনগণের অর্থে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব শিল্পকারখানা জনগণের মালিকানা উচ্ছেদ করে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থের ও তাদের মুনাফার উৎসে পরিণত হতে দেওয়া হবে না।

৫ আগস্টের স্মৃতি ও অপূর্ণতার বেদনা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

আর প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। শ্রমিক-কৃষকের বুকের কান্না যেন ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের স্পর্শ করছে না। নির্বাচিত সরকার কর্তৃক যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, তা তো অতীতের ধারাবাহিকতা মাত্র। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, প্রশাসনে, ব্যাংকে কি গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে বা তার চর্চা হচ্ছে? যেভাবে গায়ের জোরের চর্চা হচ্ছে, তাতে পুরোনো আমলের চেয়ে কী পার্থক্য ঘটলো? বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লড়াই শত সহস্র মানুষকে পথে নামিয়েছিল। মানুষ ভুলতে চেয়েছিল নারী-পুরুষ, ধর্মীয় পার্থক্য, আদিবাসীর অবহেলা। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল মানবিক মর্যাদা, দূর করতে চেয়েছিল বৈষম্যের বেদনা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন ও উন্মাদনা, নারীর লাঞ্ছনা, আদিবাসীর ভীতি, নির্বাচনবিহীন ও দায়হীন রাষ্ট্র পরিচালনা, নানা ধরনের চুক্তি যা জনগণ জানে না, এবং মব সৃষ্টি করে ভীতির পরিবেশ তৈরি—এসব কি জুলাইকে ভুলিয়ে দিচ্ছে না? জুলাই কি শুধু দিবস উদযাপনে পর্যবসিত হবে? আগস্ট কি তার পথ হারিয়ে ফেলেবে? ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে জনগণের প্রত্যাশাকে যেন পদদলিত করা না হয়, স্বপ্নগুলো যেন অধরা না থাকে—সেটাই মানুষের আশা। অতীতে প্রতিটি আন্দোলনে জনগণ যুক্ত হয়েছিল মুক্তির আশায়, কিন্তু ক্ষমতাসীনদের কর্মকাণ্ডে পরিণতিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। এটাই কি চলতে থাকবে?

নানা ঘটনার পর নির্বাচন হলো। নির্বাচিত সরকারের ওপর দায়িত্ব অভ্যর্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়া। জনগণ চায়, বিচার, প্রশাসন, পুলিশ—কোনোকিছুই যেন

জবাবদিহির বাইরে না থাকে। সংস্কার যেন শুধু সংসদীয় সাংবিধানিক বিতর্কের বিষয় হয়ে না পড়ে। ক্ষমতার দস্তে জনগণের প্রত্যাশা যেন পদদলিত না হয়, বৈষম্যমুক্তির স্বপ্নগুলো যেন অধরা না থাকে। এত আত্মত্যাগের পর অতীতের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, আর আগস্ট যেন পথ না হারায়—এটাই ছিল জনগণের ন্যূনতম চাওয়া। কিন্তু জনগণের চাওয়া যতই তীব্র এবং যৌক্তিক হোক না কেন, ক্ষমতায় কারা থাকবেন তার ওপর নির্ভর করে প্রাপ্তি কতটুকু ঘটবে। যদি শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়, আর ব্যবস্থাটা আগের মতোই থাকে, তাহলে আকাঙ্ক্ষা যতই থাক আর যত জীবন বিসর্জন হোক না কেন, জনগণের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। নির্বাচনের তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী সরকার মার্কিনদের সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী এবং মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী অসম বাণিজ্য চুক্তি করেছিল, নির্বাচিত সরকার সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে। ২০২৩ সালে আওয়ামী লীগ ডিপি ওয়ার্ল্ডকে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারও তা এগিয়ে নিয়েছিল, আর বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়নের পথে হাঁটছে। আওয়ামী সরকার ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল এবং ৬টি চিনিকল বন্ধ করেছিল, অন্তর্বর্তী সরকার তা চালু করেনি, আর বর্তমান সরকার সেগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যা প্রমাণ করে অভ্যর্থানের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত পথে সরকার হাটছে। ফলে শ্রমিক-কৃষক, নারী, শিক্ষার্থীকে তাদের সমস্যা সমাধান ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় রাজপথের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

কমরেড প্রভাত মজুমদারের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২০ জুলাই দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ খুলনা জেলার সদস্য এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট খুলনা জেলার সাবেক ছাত্রনেতা কবি প্রভাত

মজুমদার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড প্রভাত মজুমদার ছাত্র জীবনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাথে যুক্ত থেকে সংগঠনের বিকাশ এবং গণ আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দলের আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। কমরেড প্রভাত মজুমদারের মৃত্যুতে পার্টি একজন নিবেদিত কর্মীকে হারালো। কমরেড ফিরোজ তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন একই সাথে তাঁর শোকসন্তুষ্ট পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

টিপু বিশ্বাস, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সমন্বয়ক কমরেড ফয়জুল হাকিম লাল, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশররফা মিশু, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ ভূইয়া, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা মনজুর আলম মিঠু, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আহ্বায়ক মাসুদ খান, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ নাসু, সোশ্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

রিকশা-ইজিবাইক এখন বাস্তবতা

নীতিমালা-আধুনিকায়ন, নিবন্ধন, লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হবে

রিকশা, ব্যাটারিরিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে নেতৃবৃন্দ

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই '২৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক খালেদুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে বৈঠকে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সমন্বয়ক এবং বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, গবেষক ও উন্নয়নকর্মী মুসা মিয়া, সিপিডি'র জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী মমতাজুল জাম্মাত, যাত্রীপ্রতিনিধি জাকির হোসেন, গাড়িমালিক ও মেকানিক প্রতিনিধি সেকান্দার আলী, চালকপ্রতিনিধি জালাল আহমেদ। গোল টেবিল বৈঠক সম্বলনা করেন সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আল কাদেরী জয়। সভার শুরুতে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সংগ্রাম



পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী।

ধারণাপত্রে বলা হয়—

বাংলাদেশের ৬০ লাখ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধন; চালকদের লাইসেন্স-প্রশিক্ষণ; রুট পারমিট; সড়ক-মহাসড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে স্বল্পগতির ও স্থানীয় যানবাহনের জন্য পৃথক লেন বা সার্ভিস

রোড নির্মাণসহ ৮ দফা দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ গত ১৩ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। এই আন্দোলন করতে গিয়ে বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুরসহ বিভিন্ন স্থানে আমাদের নেতাকর্মীরা কারাবরণ করেছে, মামলা-হামলার শিকার হয়েছে।

এই খাতের সাথে যুক্ত বিপুল মানুষের কর্মসংস্থান এবং দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের

বাহন হিসেবে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা, ইজিবাইকের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। শুধু জীবন ও জীবিকার জন্য কাজ করা নয়, বিগত ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও রিকশাচালকরা ভূমিকা রেখেছে, জীবন দিয়েছে।

সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি আইনগত লড়াই পরিচালিত হয়েছে; ফলে ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ মহাসড়ক ব্যতীত সকল সড়কে ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের রায় প্রদান করেছিল কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো নীতিমালা চূড়ান্ত ও কার্যকর হয়নি। অভ্যুত্থানের পর প্রত্যাশা ছিল সরকার শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতি দেবে। দুঃখের বিষয়, তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যার ফলে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একতরফা ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় স্থানীয় সরকার আইনে সংশোধনী এনে স্বল্পগতির যানবাহন নাম দিয়ে নীতিমালা ও বিধিমালা ছাড়াই সিটি কর্পোরেশনসমূহে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি মালিকদের কাছে বিক্রির সরকারি চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও

রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের গণবিরোধী চক্রান্ত বন্ধ কর
১৭টি বাম-প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল

২০ জুলাই '২৬ পুরানা পল্টনস্থ সিপিবি কার্যালয়ে ১৭টি বাম-প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানা ঢালাওভাবে দেশি-বিদেশি লুটেরাদের কাছে বিক্রির সরকারি চক্রান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক ঢালাওভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানাসমূহ দেশি-বিদেশি বেসরকারি কোম্পানির বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ৫টি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করার তথ্য বিক্রির গণবিরোধী তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, দেশের বিপুল সংখ্যক শিল্পকারখানা ঢালাওভাবে নিলামে তোলার উদ্যোগ দেখে মনে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বানরের পিঠা ভাগ করার বিভ্রাট প্রচার করা হচ্ছে।

সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, দশ হাজার



একরেরও বেশি জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকারখানা 'বিদ্যমান শিল্পসম্পদে পুনঃবিনিয়োগ', 'পুনর্গঠন ও পুনঃউন্নয়ন', 'ইজারাভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদি ইজারাভিত্তিক ব্যবস্থা', 'যৌথ উদ্যোগ', 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' ইত্যাদি নামে দেশি-বিদেশি বেসরকারি কোম্পানির কাছে বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ মূলত রাষ্ট্রীয় সম্পদ তথা জনগণের মালিকানাধীন সম্পদের ওপর কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি সুপরিচালিত উদ্যোগ।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, সরকার এই উদ্যোগকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির

কর্মসূচি হিসেবে মিথ্যা প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এটি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরামর্শে অনুসৃত নব্য উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতিরই ধারাবাহিকতা মাত্র। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং দেশি-বিদেশি বড় কর্পোরেট পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও শিল্প পরিচালনা থেকে সরিয়ে দিয়ে কেবল বেসরকারি পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার যে নীতি বিগত সরকারগুলোর আমল থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে, এই উদ্যোগ তারই ধারাবাহিকতা।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান মানেই লোকসানি, অদক্ষ, উৎপাদনশীলতার ঘাটতি ও অকার্যকর। বাস্তবতা হলো, পরিকল্পিতভাবে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও মাথাভারী প্রশাসন জিইয়ে রাখা, সময়মতো অর্থ ছাড় না করা, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ না করা ও যন্ত্রের আধুনিকায়ন না করা, উৎপাদন সামগ্রীর বহুমুখীকরণ না করা, শ্রমিক প্রতিনিধিসহ অংশীজনদের সমন্বয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করা, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সরকারি শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক দখল করা এবং সরকার নীতিগত অবহেলার মাধ্যমে বহু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়ে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। এরপর সেই সংকটে সৃষ্ট লোকসানকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে জনগণের সম্পদ অতীতের মতোই পানির দামে বেসরকারি মালিকানায তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এটি কোনো অর্থনৈতিক সংস্কার নয়; বরং ধাপে ধাপে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সম্পদের বেসরকারিকরণ তথা হরিলুটের নীতি।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ভূমি ও অবকাঠামো জনগণের সম্পদ। এসব সম্পদ কেবল বর্তমান প্রজন্মের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও জাতীয় সম্পদ। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১